সন্ত্রাসের দলিল 'কোরআন' এর দুটো সুরা

আকাশ মালিক

প্রথম সুরাটির নাম 'সুরা আল্ আন্ফাল'। অপরটির নাম 'সুরা তাওবাহ্'। মুহাম্মদ 'সুরা আল্ আন্ফাল' প্রকাশ করেণ হিজরী দ্বিতীয় সনে, তাঁর ও কোরায়েশদের মধ্যকার সর্বপ্রথম যুদ্ধে (যুদ্ধে বদর) বিজয়ী হয়ে ফিরে আসার পর। আর 'সুরা তাওবাহ্' বলেছিলেন নবম হিজরীতে, কিছু অংশ 'হুদাইবিয়া' সন্ধি প্রাক্কালে, কিছু অংশ 'তাবুক' যুদ্ধের প্রস্তুতিকল্পে আর কিছু অংশ 'তাবুক' যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে। উল্লেখিত সুরা দু'টির শা'নে নুজুল বা পটভূমি বিস্তারিতভাবে আলোচনার পূর্বে দেখা যাক সুরা গুলোতে প্রধানত কি বলা হয়েছে।

সুরা আল্ আন্ফাল-

১) তারা তোমাকে যুদ্ধে-লব্ধ সম্পদ সম্মন্ধে জিজ্ঞাসা করছে। বলো, 'যুদ্ধে-লব্ধ সম্পদ' আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসুলের। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো আর নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে নাও। আর আল্লাহ্ ও তার রাসুলকে মান্য করো যদি তোমরা মুমিন হও।

(আর তো প্রশ্ন করা যায় না। ঈমান নষ্ট হওয়ার ভয় দেখানো হয়েছে। 'নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে নাও' বিশেষ করে মদীনার সেই সকল নব্য মুসলমানদেরকেই বলা হয়েছে যারা মুহাম্মদকে (দঃ) সত্যি সত্যি আল্লাহ্র রাসুল মনে করে মদীনায় আশ্রয় দিয়েছিল এবং নিজেদের জান-মাল পরিবার পরিজনদের মমতা ত্যাগ করে মুহাম্মদের কথায় যুদ্ধে অংশ গ্রহন করেছিল, পরে যুদ্ধে-লব্ধ সম্পদের ভাগ না পেয়ে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেছিল। সুরাটিতে মুহাম্মদ (দঃ) বার বার 'আল্লাহ্' শব্দটির সাথে 'রাসুল' শব্দ ব্যবহার করেছেন যা'তে মানুষ তার (মুহাম্মদের) আদেশ নির্দেশ যুক্তি-তর্ক বিহীন ভাবে আল্লাহ্রই আদেশ মনে করে এবং অন্ধভাবে তা পালন করে।
'যুদ্ধে-লব্ধ সম্পদ' তো আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসুলের', কথাটি যদি আল্লাহ্র হয়ে থাকে তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে, আল্লাহ্র সৃষ্টির প্রথম মানব হজরত আদম (দঃ) থেকে হজরত ঈসা (দঃ) পর্যন্ত কত যুগ কত শতাব্দী অতিবাহিত হলো আল্লাহ্র অথবা আল্লাহ্র কোন নবীর কোন দিন পার্থিব সম্পদের প্রয়োজন হলো না কেন?)

৭) আর স্মরণ করো, আল্লাহ্ তোমাদের সাথে দুটি দলের একটির ব্যাপারে ওয়াদা করেছিলেন যে, সেটি তোমাদের হস্তগত হবে, আর তোমরা চেয়েছিলে, যে দলের হাতে অস্ত্র ছিল না তা তোমাদের হউক। কিন্তু আল্লাহ্ চেয়েছিলেন সত্যকে স্বীয় কালামের দ্বারা সত্যে পরিণত করতে আর কাফিরদের শিকড় কেটে দিতে।

(এই আয়াত বা বাক্য পড়ে পৃথিবীর কোন ভাষাবিদ কি বুঝতে সক্ষম হবে যে উল্লেখিত দল দুটি কে বা কারা ছিল কিংবা যাদের হাতে অস্ত্র ছিল না তারা কারা ছিল, তাদের কাছ থেকে মুসলমানরা কি দখল করতে চেয়েছিল? শেষ পর্যন্ত অস্ত্রহীন দলের কি হলো? যে সকল মানুষ মুহাম্মদের (দঃ) সামনে উপস্থিত ছিল অথবা ঘঠনা প্রত্যক্ষ করেছে স্ব-চক্ষে, তারা ব্যতিত পৃথিবীর কোন্ মুসলমান কোরআন পড়ে বুঝতে পারবে এর পেছনের ঘঠনাটা কি? যে কথাগুলো মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর

গোটা কয়েক অনুসারীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন যা অন্য কোন মানুষের বোধগম্য নয়, সেই কথাগুলো সারা জগতের মানুষের জন্যে আল্লাহ্‌র চিরন্তন বাণী বলে মানুষ মেনে নেবে কেন? মুহাম্মদ (দঃ) ভালভাবেই জানতেন কোথায় কি ভাবে আক্রমন করলে কি হবে। আর মদীনায় এসে আল্লাহ্‌, কাফির বা অবিশ্বাসীদেরকে সমুলে উৎখাত বা শিকড় কর্তন করবেন কেন? তারা তো সেচ্ছায় অবিশ্বাসী হয় নি। অবিশ্বাসী হয়ে তারা আল্লাহ্‌রই ইচ্ছা পুরণ করেছে। মক্কায় আল্লাহ্‌ বল্লেন- 'তোমার প্রভু যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে সারা পৃথিবীর মানুষ এক সঙ্গে বিশ্বাস করতো। তুমি কি তবে মানুষের ওপর জবরদস্তি করবে যতক্ষন পর্যন্ত না তারা মুমিন হয়? আর কোন প্রাণীর পক্ষে সম্ভব নয় বিশ্বাস করা আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতিত।- সুরা ইউনুস, আয়াত ৯৯, ১০০)

১২) স্মরণ করো তোমার প্রভু ফেরেস্তাদেরকে প্রেরণা দিলেন- আমি নিশ্চয়ই তোমাদের সাথে আছি, কাজেই যারা বিশ্বাস করেছে তাদেরকে সু-প্রতিষ্ঠিত করো, আমি অবিশ্বাসীদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করবো, সুতরাং আঘাত হানো তাদের গর্দানে এবং তাদের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (হাতের আঙ্গুল) কেটে ফেলো।

(কি সর্বনাশী কথা, আল্লাহ্‌ মানুষকে মানুষ খুন করতে হুকুম দিলেন ! ফেরেস্তারাও খুনের দায়ীত্বে নিয়োজিত হলো। যুদ্ধে ফেরেস্তার স-সস্ত্র বাহিনী মুহাম্মদ (দঃ) ব্যতিত কেউ দেখেছিল বলে তো প্রমান পাওয়া যায় না। ঠিক তেমনি মক্কায় রচিত সুরা 'ফীল' এর বর্ণনানুযায়ী বাদশাহ্‌ আবরাহার ৬০ হাজার সৈন্যের ওপর আকাশ থেকে আবাবিল পাখির পাথর বর্ষন কেউ দেখেছিল বলে সাক্ষ্য প্রমান মিলে না। অবশ্য আবরাহার মক্কা আক্রমনের তারিখ নিয়ে আরবের ইতিহাসে বহু মত-পার্থক্য আছে। ঐতিহাসিকদের মতে আবরাহা মক্কা আক্রমন করেছিলেন মুহাম্মদের (দঃ) জন্মের কমপক্ষে এক যুগ পুর্বে। মুসলিম ইতিহাসবিদগণ মুহাম্মদের (দঃ) জন্মের সময়টাকে মহামান্বিত করার লক্ষ্যে ইতিহাস বিকৃতি করেছেন। বদর যুদ্ধের পূর্বে কোন কালে কোন নবী পয়গাম্বর স-সস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন বলে কোরআনের কোথাও লিখা নেই। সেই আবাবিল পাখিরা কোথায় গেল? আল্লাহ্‌ নমরুদকে শাস্তি দিলেন মশার দ্বারা, বাদশাহ্‌ ফেরাউনকে মারলেন সাগরের জলে ডুবিয়ে, আরো কত শত জনপদ কত সম্প্রদায় ধ্বংস করলেন নিজ হাতে। হাজার হাজার বছর ধ্বংস লীলায় ব্যস্ত আল্লাহ্‌র হাত কি এতই ক্লান্ত যে মানুষ খুনের দায়ীত্ব এবার মানুষের হাতেই তোলে দিলেন?

১৩) যেহেতু তারা আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র রাসুলের অবাধ্য হয়েছে, আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র রাসুলের বিরোধিতা করেছে তাই তাদের জন্যে এই শাস্তি। আর যে কেউ আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র রাসুলের বিরোধিতা করে- আল্লাহ্‌ তবে শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর।

('শাস্তিদানে আল্লাহ্‌ অত্যন্ত কঠোর' মক্কায় থাকতে এ কথাটি মুহাম্মদ বহুবার বলেছেন এবং অনেক উপমা উদাহরণও দিয়েছেন । কিন্তু বিগত ১২ বৎসর যাবত বাস্তবে শাস্তি ভোগ করেছেন শুধু মুসলমানরাই স্বদেশে এবং বিদেশে। আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র রাসুলের বিরোধিতা করে মানুষ কামনাও করেছে, ওপর থেকে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের ওপর শাস্তি আসুক। কিন্তু আল্লাহ্‌ অপারগতা দেখালেন। প্লাবন, মশা, আবাবিল, ঝড়, বৃষ্টি, মহামারি সবকিছু পড়ে রইলো মক্কায় রচিত কল্প-কাহিনী হয়ে। মদীনায় এসে শাস্তিদানের হাতিয়ার হিসেবে আল্লাহ্‌ হাতে তোলে নিলেন তীর-বর্শা আর শাণিত তলোয়ার।

১৭) সুতরাং তোমরা তাদেরকে খুন করোনি বরং আল্লাহ্‌ই খুন করেছেন, আর তুমি ছোঁড়ে মারোনি বরং ছোঁড়ে মেরেছিলেন স্বয়ং আল্লাহ্‌ যেন তিনি ঈমানদারগণকে দিতে পারেন উত্তম পুরস্কার। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা।

(হায় ! হায় ! সর্বনাশ। এ বিশ্বপতির কথা হতে পারে না। মহান আল্লাহ্ তারই সৃষ্টির সাথে যুদ্ধ করতে সুদুর আকাশের ঠিকানা থেকে নেমে আসলেন বদর প্রান্তে? এক দিকে (কোরআনের মতে, ক্ষিপ্ত বেগে বেরিয়ে আসা না-পাক 'লুতফা' থেকে সৃষ্টি) ছয় শো জন মাটির মানুষ, অপর দিকে আল্লাহরই নুরের তৈরী নবী মুহাম্মদ (দঃ) যার উছিলায় এই বিশ্ব-ভ্রহ্মান্ড, সেই সাথে নুরের তৈরী এক হাজার আর্মি ফেরেস্তা নিয়ে তলোয়ার বর্শা হাতে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা? পায়ের নীচে পড়া পিপীলিকার সাথে বন্য পশু হাতির লড়াই না হয় মেনে নেয়া যায় কিন্ত এ যে সকল সৃষ্টির মহান স্রষ্টা আল্লাহ্। বিশ্ব-প্রভুর কি শোচনীয় অপমান। আল্লাহ্র যদি কাফির মারার ইচ্ছে হতো তিনি বলতেন 'মর' ব্যস ওরা সব মরে সাফ হয়ে যেতো।)

২০) ওহে, যারা ঈমান এনেছ, আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসুলের আদেশ পালন করো, এবং আদেশ শুনার পর তার থেকে ফিরে যেও না।

(যুদ্ধে মানুষের অনীহা? ওরা ভাবতেই পারেনি মুসলমান হয়ে যুদ্ধ করতে হবে গোত্রের বিরুদ্ধে গোত্রকে, ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাইকে, বাবার বিরুদ্ধে সন্তানকে।

২৪) ওহে, যারা ঈমান এনেছ, আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসুলের আদেশ পালন করো যখন তোমাদেরকে সে কাজের প্রতি ডাকা হয় যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন। আর জেনে রেখো আল্লাহ্ মানুষ ও তার মনের অন্তরায় হয়ে যান, নিঃসন্দেহে তার কাছে তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে।

২৬) স্মরণ করো তোমরা সংখ্যায় অল্প ছিলে, দুর্বল অবস্থায় পড়ে রয়েছিলে দেশে, ভীত সন্ত্রস্ত ছিলে যেন লোকেরা তোমাদেরকে ধরে নিয়ে যাবে। তখন তিনি তোমাদেরকে আশ্রয়ের ঠিকানা দিলেন, স্বীয় সাহায্যে তোমাদিগকে শক্তি দিলেন এবং উত্তম জীবিকা দিলেন যেন তোমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে পারো।

(কথাগুলো নির্দিষ্টভাবে সেই সকল কোরায়েশদেরকে বলা হচ্ছে যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহন করে মুহাম্মদের (দঃ) সাথে ও পরে মদীনায় এসেছিল এবং যুদ্ধে অংশ গ্রহন করেছিল। মক্কার শরণাথীগন মদীনায় এসে দুই বৎসরের মাথায় উত্তম জীবিকার সন্ধান পেলেন কি ভাবে? কি এমন ধন নিয়ে তারা মদীনায় এলেন? জীবিকার উৎস কি ব্যবসা-বানিজ্য না কি কৃষিকাজ? বাস্তব ইতিহাসে তো এমন কোন উৎসের সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে কি যুদ্ধে-লব্ধ সম্পদই আল্লাহ্র দেয়া উত্তম রিজেক? ১২ বৎসর যাবত আবিসিনিয়ায় পালিয়ে যাওয়া মুসলমানদের দুর্গতি আল্লাহ্ দেখেন না? সে দেশে আল্লাহ্র উত্তম জীবিকা নেই? আর প্রীয় মানুষদেরকে আল্লাহ্ কেনই বা বিদেশে আশ্রয়ের ঠিকানা দিবেন? বদরের মাঠে ১০০০ আর্মি ফেরেস্তা দিয়ে সাহায্য করতে পারলেন, মক্কায় পারলেন না? মাত্র ৫২ বছর পূর্বে আবরাহার ৬০ হাজার সৈন্যকে পাখি দিয়ে পরাজিত করে ৩৬০ দেবতার ঘর মক্কা বাঁচাতে পারলেন আর তার প্রীয় নবী ও বান্দাদেরকে আল্লাহ্ স্ব-দেশে রাখতে পারলেন না?

৩০) আর স্মরণ করো অবিশ্বাসীরা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল যে, তারা তোমাকে আটক করবে, অথবা হত্যা করবে অথবা নির্বাসিত করবে। তারা ষড়যন্ত্র করেছিল আর আল্লাহ্ও পরিকল্পনা করেছিলেন। আর পরিকল্পনাকরীদের মধ্যে আল্লাহ্র পরিকল্পনাই শ্রেষ্ট।

(মানুষের সাথে আল্লাহ্ প্রতিযোগীতা করেন, কে কার চেয়ে ভাল পরিকল্পনা করতে পারে। পলায়নের পরিকল্পনার মধ্যে আবার বাহাদুরির কি আছে?)

৩১) যখন তাদের কাছে আমার বাণী পড়ে শুনানো হয়, তারা বলে- 'আমরা ইতিমধ্যেই শুনেছি, আমরাও এর মতো বলতে পারি। এ তো পুরনো উপকথা বৈ কিছু নয়'।

(দুর্মখদের কেমন স্পর্ধা ! আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসুলকে চ্যালেঞ্জ করে। এদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়া উচিৎ। আল্লাহ্ তো শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর।

৩২) আর স্মরণ করো তারা বলেছিল- 'হে আল্লাহ এই যদি তোমার সত্য ধর্ম হয়, যদি কোরআন সত্য হয় তাহলে আমাদের ওপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষন করো অথবা আমাদেরকে কঠিন শাস্তি দাও'।

(এতো সব মর্মন্তুদ শাস্তির কাহিনী শুনেও তারা আল্লাহ্র গজব কামনা করে?

৩৩) আল্লাহ কখনো তাদেরকে শাস্তি দিবেন না যতক্ষন আপনি তাদের মাঝে আছেন, আর তারা যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে।

(কি আজব ব্যাপার ! মক্কায় শাস্তি দেয়া যায় না, মদীনায় দেয়া যায়। সরাসরি স্ব-বিরোধী কথা ! বদরের যুদ্ধে কাফিরদেরকে আল্লাহ্ শাস্তি দিলেন, না আশির্বাদ করলেন? যুদ্ধ চলাকালে মুহাম্মদ তাদের মাঝে ছিলেন, না কি পৃথিবী ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গিয়েছিলেন?

৩৪) আর কি বা তাদের আছে যে আল্লাহ্ তাদের শাস্তি দিবেন না যখন তারা মসজিদে (কা'বা ঘরে) যেতে বাধা দেয়? অথচ তাদের সে অধিকার নেই, তারা এর তত্বাবধায়ক নয়। এর তত্বাবধায়ক হচ্ছে শুধু পরহেজগারগণ, কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।

(৩৩ আর ৩৪ নম্বর বাক্য দুটো কি পরস্পর বিরোধী নয়? ৩৬০ দেবতার ঘরের তত্বাবধায়ক হবে মুসলমান, তা'ও মুহাম্মদের জন্মের ৫২ বছর পর?)

৩৫) কা'বা ঘরের নিকটে তাদের নামাজ বলতে শুধু শীষ বাজানো আর হাততালি দেয়া ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং এবার অবিশ্বাসী হওয়ার স্বাধ গ্রহন করো।

(হাততালি দেয়া আর শীষ বাজানোর ধর্মই তো মুহাম্মদের মা আমিনা, বাবা আব্দুল্লাহ্র ধর্ম ছিল। সেই ধর্মানুসারেই তো বিয়ে করলেন মুহাম্মদ এবং নিজের মেয়ে রোকেয়া ও কলসুমের বিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের ধর্মে তারা হাততালি দিলে, শীষ বাজালে মুসলমানের কি আসে যায়? মক্কায় সুরা 'কাফিরুন' এ আল্লাহ্ বল্লেন- 'তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্যে আমার ধর্ম আমার জন্যে'। মদীনায় এসে অন্য ধর্মের সমালোচনা কেন? আল্লাহ্ নিজেই যদি অন্য ধর্মকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেন তাহলে মুসলমানদের কি করা উচিৎ?

৪১) আর যদি তোমরা বিশ্বাস করো আল্লাহ্তে ও আমার বাণীতে যা আমি অবতীর্ণ করেছি রাসুলের ওপর ফুরকানের (বদরের যুদ্ধের) দিনে, যেদিন দুই দল মুখোমুখী হয়েছিল, তাহলে জেনে রাখো, যুদ্ধে যা কিছু সম্পদ তোমরা লাভ করো তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ্র তথা রাসুলের ও রাসুলের নিকটাত্বীয়ের আর এতিম গরীব ও পথচারীদের জন্যে। আর আল্লাহ্ সব কিছুর ওপরে সর্বশক্তিমান।

(এতক্ষণে পাওয়া গেলো মালের ভাগের হিসেব। মালের ভাগের হিসেবে রাসুলের নিকটাত্মীয়েরা খুশি হলেও মদীনার মানুষ এ নিয়ে প্রশ্ন তোলতেই পারে। মাল পেয়েও কি তাদের যুদ্ধের প্রতি উৎসাহ বাড়বে? আপন গোত্রের সাথে গলা কাটাকাটি। এই যুদ্ধে কোরায়েশ বংশের হজরত আবু সুফিয়ানের দুই পুত্র অর্থাৎ হজরত মোয়াবিয়ার দুই ভাই খুন হয়েছিলেন। কিছুটা অনুশোচনা কোরায়েশদেরও হতেই পারে।)

৬৫) হে প্রীয় নবী, মুসলমানগণকে যুদ্ধের জন্যে উৎসাহিত করুন। যদি তোমাদের মধ্যে কুড়িজন দৃঢ়পদ ব্যক্তি (Diehard) থাকে তবে তারা দু'শো জনকে পরাজিত করবে, আর যদি এক'শো জন থাকে তবে এক হাজার জনকে পরাজিত করবে, কারণ কাফিরেরা জ্ঞানহীন।

(আনুপাতিক হিসেবটা ঠিকই আছে)

৬৬) এখন আল্লাহ্ তোমাদের বোঝা হালকা করে দিয়েছেন, তিনি জানেন তোমাদের মাঝে দূর্বলতা আছে। কাজেই যদি তোমাদের মধ্যে এক শো জন (Diehard) থাকে তবে তারা দু'শো জনকে পরাজিত করবে, আর যদি এক হাজার জন থাকে তবে তারা আল্লাহ্র হুকুমে দুই হাজার জনকে পরাজিত করবে। আর আল্লাহ্ ধৈর্য্যশীলদের সাথী।

(৬৫ নং আয়াত অনুযায়ী ২০ জন মুসলমান = ২০০ জন কাফির, আর ১০০ জন মুসলমান = ১০০০ জন কাফির, অর্থাৎ ১ জন মুসলমান = ১০ জন কাফির। আর পরের আয়াত অনুযায়ী ১০০ জন মুসলমান = ২০০ জন কাফির, আর ১০০০ জন মুসলমান = ২০০০ জন কাফির, অর্থাৎ ১ জন মুসলমান = ২ জন কাফির। বিষয়টা কী ? শুভঙ্করের ফাঁকি, না অংকে গন্ডগোল? আচ্ছা, অতিরিক্ত শক্তি ও মাল তো পাওয়া গেলো এবার যুদ্ধে বন্দীদের কি করা যায়?)

৬৭) নবীর জন্যে বন্দীদেরকে রাখা সঙ্গত নয় যতক্ষণ না দেশময় প্রচুর রক্তপাত ঘঠেছে, তোমরা চাও ইহকাল আর আল্লাহ্ চান পরকাল। আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী হেকমতওয়ালা।

(আয়াতটির ইংরেজী অনুবাদ নিম্নরূপ- It is not for a Prophet that he should have prisoners of war (and free them with ransom) until he had made a great slaughter (among his enemies) in the land. You desire the good of this world (i.e. the money of ransom for freeing the captives), but Allâh desires (for you) the Hereafter. And Allâh is All-Mighty, All-Wise . (www.quraanshareef.org)
এই মুহূর্তে কোন বিনিময় মুল্যে বন্দীদেরকে ছেড়ে দিলে মুসলমানগণই বিশ্বাস করতেন না যে, যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্পদ নয় বরং আল্লাহ্র নির্দেশ।)

৬৮) বিষয়টা যদি আগে থেকেই আল্লাহ্র কাছ থেকে অনুমুদিত না থাকতো তাহলে তোমরা (যুদ্ধে) যে সম্পদ অর্জন করেছিলে তার জন্যে তোমাদের ওপর শাস্তি এসে যেতো।
৬৯) সুতরাং ভোগ করো যুদ্ধে যা অর্জন করেছো পরিচ্ছন্ন হালাল বস্তু হিসেবে। আর আল্লাহ্কে ভয় করতে থাকো, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল মেহেরবান।

(খাও গাও, ফুর্তি করো কোন্ গাছের ফল জিজ্ঞেস করো না। যুদ্ধে-লব্ধ সম্পদ গ্রহন করতে মানুষ কি দ্বিধা-গ্রস্থ ছিল?)

৭০) হে নবী, তোমার হাতে যারা বন্দী রয়েছে তাদেরকে বলে দাও যে আল্লাহ্ যদি জানতে পারেণ তোমাদের মনে ভাল কিছু চিন্তা আছে তাহলে তোমাদেরকে তার চেয়ে বহুগুণ বেশী দান করবেন যা তোমাদের কাছ থেকে নেয়া হয়েছে। আর তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।

(ধর্মের বানিজ্য হচ্ছে? কৌশলে বশ্যতা মেনে নেয়ার জন্যে চাপ সৃষ্টি? জগতের কোন মানুষ কি বলতে পারেন একজন যুদ্ধ-বন্দীর কাছ থেকে যা নেয়া হয়েছে তার চেয়ে উত্তম কি ফেরত দেবার আছে? মা কে সন্তান দেয়া যাবে, সন্তানকে বাবা? মানবতা নিয়ে মুহাম্মদের কি হীন তামাশা !)

৭১) আর যদি তারা তোমার সাথে প্রতারণা করতে চায়, এর আগে তারা আল্লাহ্র সাথে প্রতারণা করেছে সুতরাং আল্লাহ্ (তোমাকে) তাদের ওপরে প্রাধান্য দিলেন। আর আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে পরিজ্ঞাত ও সু-কৌশলী।

(কথাটি যে মুহাম্মদের তা'তে কোন সন্দেহ নেই কারণ সর্ব বিষয়ে পরিজ্ঞাত ও সু-কৌশলী আল্লাহ্ সন্দেহ সুচক শব্দ 'যদি' ব্যবহার করতে পারেণ না। কাফিররা কি করবে, না করবে আল্লাহ্ যদি আগে থেকে না জানতেন, তা'হলে বদরের যুদ্ধ সহ যে সকল যুদ্ধ এখনো ঘঠেনি তার বিবরণ হাজার বছর আগে কোরআনে লিখে লাওহে মাহফুজে সযতনে রাখলেন কি ভাবে? কোরআনে আল্লাহ বহুবার বলেছেন যে তিনি কাফিরদের মনে কি আছে তা ভালভাবেই জানেন। এই সুরারই ৬০ নম্মর আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন- 'আর প্রস্তুত রাখবে (মুসলমানগণকে) সবটুকু সামর্থ্য দিয়ে যা কিছু তোমাদের আছে, তেজী যুদ্ধের ঘোড়া দিয়ে, আর তার দ্বারা ভীত-সন্ত্রস্ত রাখবে আল্লাহ্র শত্রুদের তথা তোমাদের শত্রুদের এবং অন্যান্যদেরকেও যাদেরকে তোমরা জানো না, আল্লাহ্ তাদেরকে চেনেন। আর যা কিছু তোমরা আল্লাহ্র রাস্তায় (যুদ্ধে) ব্যয় করবে তা তোমরা পরিপূর্ণ ফিরে পাবে আর তোমাদের ওপর অবিচার করা হবে না'।

এখানেও (www.quraanshareef.org থেকে) একটি হাস্যকর ইংরেজী অনুবাদ তোলে দিতে হলো। 'And make ready against them all you can of power, including steeds of war (tanks, planes, missiles, artillery, etc.) to threaten the enemy of Allâh and your enemy, and others besides whom, you may not know but whom Allâh does know. And whatever you shall spend in the Cause of Allâh shall be repaid unto you, and you shall not be treated unjustly'.

'ভীত-সন্ত্রস্ত রাখবে অন্যান্যদেরকেও যাদেরকে তোমরা জানো না'। এরা কারা? সারা পৃথিবী দুই ভাগ হয়ে গেলো, একদিকে পৃথিবীর সকল মানুষ অন্যদিকে মুসলমান। সেদিন ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল আরববাসী আর আজ আল্লাহ্র সৈন্যদের পদভারে সারা বিশ্বই ভীত-সন্ত্রস্ত।

এবার (উর্দু) তাফহিমুল কোরআন (পৃষ্ঠা ৯১৮ - ৯২৭) থেকে সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী কর্তৃক বণীত সুরা আনফালের 'শানে নুজুল' এর সারাংশ।

এই সুরা হিজরী দ্বিতীয় সালে কাফির ও মুসলমানদের মধ্যকার সর্ব প্রথম যুদ্ধ, ‘যুদ্ধে-বদর’ এর পরে অবতীর্ণ হয়। যেহেতু সুরাটিতে যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়াদির ওপর ব্যাপক আলোচনা স্থান পেয়েছে, তাই অনুমান করা যায় যে পুর্ণ সুরাটি একই সময়ে নাজিল হয়েছিল। তবে এটাও সম্ভব যে বেশ কিছু আয়াত যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট সমস্যার ওপর নির্দেশাবলী হিসেবে, পরে বিভিন্ন সময়ে নাজিল হয়েছিল এবং পরবর্তিতে ঘঠনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পুনরায় যথাস্থানে সংযোজন করা হয়েছে। তবে এটা মনে করা ঠিক হবে না যে সুরাটি বিভিন্ন সময়ে বণীত বিচ্ছিন্ন কিছু বাক্যের সমষ্টি।

সুরাটির ওপর বিস্তারিত আলোচনার পুর্বে বদরের যুদ্ধের কারণগুলো আমাদের জানা প্রয়োজন। ইসলামের প্রথম দশ/বারো বৎসরে, রাসুলুল্লাহ্‌র (দঃ) মক্‌কা থাকাকালিন সময়েই তাঁর নবুওতীর বার্তা স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। এর প্রধানত দুটি কারণ ছিল। প্রথম কারণ, সৎ-চরিত্রের অধিকারী নবীজীর (দঃ) মহানুভবতা ও দুরদর্শীতার সাথে ইসলাম প্রচার করা। নবী (দঃ) তাঁর কার্য-ক্রমের মাধ্যমে প্রমান করে দিয়েছিলেন যে, সকল প্রকার বাধা বিঘ্ন উপেক্ষা করে তিনি অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। দ্বিতীয় কারন, মন-মুগ্ধকর ইসলামের প্রতি মানুষের অপ্রতিরোদ্ধ আকর্ষন। সুতরাং কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা নবীজীর অগ্রযাত্রা রুখে দাঁড়াতে সক্ষম হলো না। তাই নবীজীর মক্‌কী জীবনের শেষ পর্যায়ে আরব নেতাগণ ইসলামকে তাদের ধর্মের প্রতি বিরাট হুমকি মনে করে, তাদের সর্ব শক্তি দিয়ে ইসলামের অগ্র-যাত্রা চিরতরে ধ্বংস করে দিতে বদ্ধপরিকর হলো। এদিকে নতুন ধর্ম ইসলাম পূর্ণ বিজয়ের লক্ষ্যে কাফিরদের সকল প্রতিবন্ধকতা জয় করার মতো শক্তি অর্জন করতে তখনো সক্ষম হয় নি। প্রথম কারণ - তখনো প্রমানিত হয় নি যে, তেমন যথেষ্ট মানুষ মুসলমান হয়েছে যারা শুধু ইসলাম ধর্মই গ্রহন করে নি বরং ইসলামের লক্ষ্য ও আদর্শ মনে প্রাণে মেনে নিয়ে, ইসলামের জন্যে তাদের জান-মাল সর্বস্ব বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। শুধু তা’ই নয়, এটাও দেখার বিষয় যে নতুন মুসলমানগণ কি প্রস্তুত সারা পৃথিবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে, এমন কি সে যুদ্ধ যদি হয় তাদের আপনজনদের বিরুদ্ধে। যদিও মুসলমানগণ ইসলামের প্রাথমিক যুগে কোরায়েশদের অপরিসীম নির্যাতন সহ্য করে প্রমান করেছেন যে ইসলামের প্রতি তাদের দৃঢ় ঈমান ও অকুণ্ঠ সমর্থন রয়েছে। তথাপি ইসলাম যে তার এমন একটি অনুসারী দল তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে যারা এই পৃথিবীতে ইসলামের চেয়ে অধিক প্রীয় আর কিছু মনে করে না এবং তারা তাদের ধর্মের জন্যে সর্বদা জীবন দিতে প্রস্তুত, তা’ প্রমান করার জন্যে এখনো অনেক পরীক্ষা বাকি। দ্বিতীয় কারণ- যদিও ইসলামের বার্তা দেশের সকল যায়গায় পৌছে গিয়েছিল এবং তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল সর্বত্র, তথাপি একটি পুরনো কুসংস্কারাচ্ছন্ন শক্তিশালী সমাজের তীব্র আক্রমনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার প্রয়োজনীয় শক্তি তখনো ইসলামের ছিল না। তৃতীয় কারণ- তখনো ইসলাম তার আলাদা কোন আবাসস্থল বা কেন্দ্রস্থান গড়ে তোলতে পারে নি যেখান থেকে সু-দৃঢ় শক্তি বর্ধন করা যায় ও পরবর্তি করণীয় পদক্ষেপ নেয়া যায়। আর তখন কাফের সমাজের অভ্যন্তরেই ছিল বিচ্ছিন্ন ভাবে দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়া মুসলমানগণের বাসস্থান। যারা তাদেরকে সমূলে দেশ থেকে বিতাড়িত করে দিতে সর্বদাই ছিল উদ্যোত। চতুর্থ কারণ- মুসলমানগণ তখনো বাস্তবে ইসলামী জীবনের ফল ভোগ করার সুযোগ পান নি। তখন মুসলমানদের জন্যে না ছিল আলাদা কোন ইসলামী রাষ্ট্র, না ইসলামী সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ও সামরিক আইন বিধি ব্যবস্থা। তাই ইসলামী আদর্শে নিজের জীবন গড়ে তোলার ও পৃথিবী জুড়ে ইসলামী আইন ও আদর্শ বাস্তবায়নের সুযোগ মুসলমানগণ তখনো পান নি।

বারো বৎসর পরে এবার আল্লাহ-পাক মুসলমানদেরকে সেই সুযোগটা করে দিলেন। নবীজীর (দঃ) মক্কায় থাকাকালীন শেষ চার বৎসরে ইসলামের সু-মহান বাণী মদীনায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। নানা কারণে মদীনার মানুষ তুলনামুলক ভাবে অন্যান্য এলাকার মানুষের চেয়ে অধিক হারে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করতে থাকে। ইসলামের দ্বাদশ বর্ষে মদীনা থেকে হজ্জের মৌশুমে ৭৫জন লোকের একটি প্রতিনিধি দল রাতের অন্ধকারে নবী মুহাম্মদের (দঃ) সাথে সাক্ষাৎ করেন। তারা শুধু ইসলাম ধর্মই গ্রহন করেন নি বরং নবী করিম (দঃ) ও তাঁর অনুসারী মুসলমানগণকে মদীনায় আশ্রয় দিবেন বলে ওয়াদাবদ্ধ হলেন। ইসলামের ইতিহাসে এ ছিল মুসলমানদের জন্যে যুগান্তর সৃষ্টিকারী সংগ্রামী আহ্বান যা আল্লাহ্ প্রদত্ত এক পরম নেয়ামত। আল্লাহ্র নবী (দঃ) এমন সুবর্ণ সুযোগটি দু হাত বাড়িয়ে স্বাদরে গ্রহন করে নিলেন। মদীনাবাসী স্পষ্টই জানতেন যে তারা একজন পলাতক মানুষকে আশ্রয় দিচ্ছেন না বরং আল্লাহ্র একজন নবীকে (দঃ) আহ্বান করছেন যেন তিনি তাদের নেতা এবং শাসক হন। মক্কার মুসলমানগণকে মদীনাবাসী অপরিচিত একদল নির্যাতিত শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় দানের জন্যে আহ্বান করেন নি বরং তারা চেয়েছিলেন মক্কার মুসলমানগণ সহ দেশের অন্যান্য যায়গার সকল মুলমানগণকে একত্রিত করে মদীনায় একটি সঙ্গবদ্ধ মুসলিম সমাজ গড়ে তোলতে। এমনি ভাবে তারা মদীনাকে 'ইসলামী শহর' হিসেবে উপস্থাপন করলেন আর আল্লাহ্র রাসুল (দঃ) তাদের নিমন্ত্রণ গ্রহন করতঃ একদিন মদীনাতেই আরব দেশের 'প্রথম ইসলামের রাজধানী' প্রতিষ্ঠিত করেন।

মদীনার লোকজন নিশ্চয়ই অবগত ছিলেন যে এই নিমন্ত্রণের পরিণতি কি হতে পারে। স্পষ্টই এই নিমন্ত্রনের অর্থ ছিল সারা আরব বিশ্বের প্রতি যুদ্ধ ঘোষনা করা এবং নিজেদের জন্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক বয়কট ডেকে আনা। 'আকাবা'য় মদীনার আনসারগণ যখন আল্লাহ্র রাসুলের (দঃ) প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করেন তখন তারা ভালভাবেই জানতেন এর প্রতিক্রীয়া কি হবে। আনুষ্ঠানিক ভাবে তারা আনুগত্য প্রকাশ করার পূর্বে, মদীনার প্রতিনিধি দলের সর্ব কনিষ্ঠ ব্যক্তি আসাদ ইবনে জুরায়রা জন-সমক্ষে দাঁড়িয়ে ঘোষনা দেন- 'হে মদীনাবাসী, আপনারা খুব সতর্কতার সাথে মনযোগ দিয়ে লক্ষ্য করুন, যদিও আমরা এখানে এসেছি তাঁকে শুধুমাত্র একজন নবী মনে করে, কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে যে তাঁর প্রতি আনুগত্যের অর্থ হচ্ছে সারা আরব বিশ্বের সাথে যুদ্ধ ঘোষনা করা। আমরা যখন তাঁকে মদীনায় নিয়ে যাবো তখন আমাদেরকে আক্রমন করা হবে, হত্যা করা হবে আমাদের সন্তান পরিবার পরিজনকে । সকল দিক বিবেচনা করে মৃত্যুর ঝুঁকি নেয়ার যদি সাহস থাকে তখন, শুধু তখনই আপনারা তাঁর প্রতি আনুগত্য ঘোষন করুন, আল্লাহ্ আপনাদেরকে পুরুস্কৃত করবেন। কিন্তু যদি ইসলাম ও নবীর (দঃ) জীবনের চেয়ে নিজেদের সহায় সম্পত্তি, আপনজন, ও স্ত্রী-সন্তানদের মায়া বেশী হয় তাহলে এখনো সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার সময় আছে, হয়তো আল্লাহ্ এ জন্যে আমাদের কোন অপরাধ নেবেন না।

মদীনার প্রতিনিধি দলের অন্য একজন সদস্য, আব্বাস বিন্ উবায়দাহ্ বিন্ না'লা ঐ কথার পুনরাবৃত্তি করে বলেন- 'আপনারা সত্যই কি বুঝতে পারছেন, এই মানুষটির প্রতি আনুগত্য ঘোষনা করার পরিণতি কি দাঁড়াবে? তাঁর প্রতি আনুগত্যের অর্থ হলো, সারা পৃথিবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করা। এই মানুষটিকে নিমন্ত্রণের মা'নে হলো আপনাদের জান-মলের প্রতি নিশ্চিৎ বিপদ ডেকে আনা। সুতরাং গভীর ভাবে চিন্তা করুন। যদি আপনাদের মনে কোন প্রকার দুর্বলতা থাকে এবং মনে করেণ, বিপদ যখন আসবে তখন তাঁকে তাঁর শত্রুদের হাতে

তোলে দেবেন, তাহলে এক্ষুনি তাঁকে ছেড়ে যাওয়া উচিৎ। কেননা, আল্লাহর কসম, অন্যতায় আমরা ভীষন ক্ষতিগ্রস্থ হবো ইহকালে ও পরকালে। আর যদি আন্তরিক ভাবে স্বীকার করে নেন যে তাঁর কাছে 'বয়াত' (দ্বীক্ষা) গ্রহনের কারণে যত প্রকার নির্যাতন-নিপীড়ন আসুক না কেন মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত আছেন তাহলে আনুগত্যের শপথ নিন, আল্লাহ্‌র কসম এর বিনিময়ে আপনারা পুরস্কৃত হবেন দুনিয়া ও আখেরাতে'। এর পর সকলে এক বাক্যে ঘোষনা দেন- 'আমরা তাঁর জন্যে আমাদের সকল ধন-সম্পদ, মান-সম্মান, পরিবার-পরিজন সর্বস্ব বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। ইসলামের ইতিহাসে বিখ্যাত এই 'বয়াত' 'দ্বিতীয় বাইয়্যাতে আকাবা' নামে অভিহত।

এদিকে মক্‌কার জনগনের বুঝতে বাকী রইলোনা যে, এই আনুগত্যের ফল কি দাঁড়াবে? অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী নবী মুহাম্মদকে (দঃ) মক্‌কার মানুষ ভালভাবেই চেনেন। তারা বুঝতে পারলেন মুহাম্মদ (দঃ) এখন তাঁর বলিষ্ট নেতৃত্বের দ্বারা একটি সঙ্গ-বদ্ধ শক্তিশালী সমাজ তৈরী করে নেবেন। আর তা' হবে তাদের পুরাতন ধর্মের জন্যে নিশ্চিৎ মৃত্যুর পরোয়ানা। মক্‌কাবাসীর জীবিকার প্রধান উৎস ব্যবসা-বানিজ্যের দিক দিয়ে মদীনার গুরুত্ব তাদের অজানা ছিল না। মদীনার ভৌগুলিক অবস্থানটাও ছিল মক্‌কার কোরায়েশদের দুশ্চিন্তার কারণ। ইয়ামন ও সিরিয়ার মধ্যবর্তি বানিজ্য-পথে মালামাল নিয়ে যাতায়াতকারী বণিকদলকে মদীনা থেকে আক্রমন করা মুসলামানদের জন্যে খুবই সুবিধাজনক। তাদের ভয় হলো, মুসলামানগণ বণিকদলকে অনায়াসে আক্রমন করবে, আর তা হবে মক্‌কার অর্থনীতির মূলে চরম আঘাত। তায়েফ ও অন্যান্য শহর ছাড়াও শুধু মক্‌কার বণিকগনই এই পথে বৎসরে কমপক্ষে দুই লক্ষ দিরহাম মূল্যের সম্পদের বানিজ্য করতেন।

'বাইয়্যাতে আকাবা'র সংবাদ পেয়ে কোরায়েশগণ ভীষণ রাগান্বিত হলেন। তারা প্রথমে মদীনার প্রতিনিধি দলকে নিজেদের পক্ষে আনার চেষ্ঠা করলেন। কিন্তু যখন দেখা গেলো একজন দুইজন করে মক্‌কার মুসলমানগণ স্বদেশ ছেড়ে মদীনায় চলে যাচ্ছেন, কোরায়েশগণ বুঝতে পারলেন, খুব শীঘ্রই মুহাম্মদ (দঃ) ও দেশত্যাগ করতে যাচ্ছেন। সুতরাং তারা এই ভয়ানক পরিস্থিতির চিরস্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে এক বৈঠক আহ্‌বান করলেন। বৈঠকে দীর্ঘ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হলো, বনি-হাশিম ছাড়া কোরায়েশ বংশের প্রত্যেক পরিবার থেকে একজন করে লোক নেয়া হবে আর এরা সম্মিলিতভাবে মুহাম্মদকে (দঃ) হত্যা করবে। কিন্তু আল্লাহ্‌র কৃপায় রাসুলের (দঃ) দৃঢ় ঈমান ও অতুলনীয় দুরদর্শীতার কাছে তাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেলো। নবীজী (দঃ) নিরাপদে মদীনায় চলে যেতে সক্ষম হলেন। কোরায়েশগণ তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়ে মদীনার একজন প্রভাবশালী নেতা আব্দুল্লাহ্‌ বিন্‌ উবায়কে মুহাম্মদের (দঃ) বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে চাইলেন। আব্দুল্লাহ্‌ নবীজীকে (দঃ) মদীনায় আশ্রয় দেয়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন। কোরায়েশগণ আব্দুল্লাহ্‌র কাছে এই মর্মে পত্র লিখলেন- 'তোমরা আমাদের লোকজনকে তোমাদের দেশে আশ্রয় দিয়েছো। তোমরা যদি এদেরকে দেশ থেকে তাড়িয়ে না দাও, আল্লাহ্‌র কসম আমরা তোমাদের দেশ দখল করে নেবো, তোমাদের পুরুষদেরকে হত্যা করবো এবং তোমাদের নারীদেরকে আমাদের দাসী বানাবো'। চিটিটি আব্দুল্লাহ্‌র মনে নবীজীর (দঃ) প্রতি আরো ক্ষোভ বৃদ্ধি করলো বটে কিন্তু সে কোন প্রকার অনিষ্ঠ করার আগেই নবীর (দঃ) সতর্ক পদক্ষেপ গ্রহন করণে তার সকল অপচেষ্ঠা ব্যর্থ হয়ে যায়।

মদীনার অন্য একজন নেতৃস্থানীয় লোক সা'দ বিন মুয়াজ যখন ওমরাহ্ হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা গিয়েছিলেন, কা'বার দ্বার-প্রান্তে আবু জেহেল তাঁকে বাধা দিয়ে বল্লেন-' তুমি কি মনে করো তোমাকে শান্তিতে হজ্জ করতে দেয়া হবে, যখন তোমরা আমাদের দুশমনদেরকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছো এবং নিজ দেশে আশ্রয় দিয়েছো? তুমি যদি উমাইয়া বিন কাহাফের অথিতি না হতে আল্লাহ্র কসম এখান থেকে জীবিত ফিরে যেতে পারতে না'। সা'দ বল্লেন- 'আবু জেহেল, আল্লাহ্র কসম, তুমি যদি হজ্জ করতে আমাকে বাধা দাও তাহলে তোমাদেরকে এমন এক যায়গায় বাধা দেবো, যা হবে তোমাদের জীবন মরণ সমস্যা। আমরা মদীনার কাছে তোমাদের বানিজ্য-পথ বন্ধ করে দেবো'। আসলে এই ঘঠনার মধ্য দিয়েই ঘোষনা হয়ে যায় যে, আজ থেকে মদীনার মুসলমানদের জন্যে মক্কায় এসে হজ্জ করা আর মক্কাবাসীর জন্যে মদীনার পথ দিয়ে সিরিয়ায় বানিজ্য করা বন্ধ হয়ে গেলো। সত্যি বলতে কোরায়েশ ও অন্যান্য অমুসলিমদের বিদ্বেষী আচরণের জবাব দেয়ার, মুসলমানদের জন্যে এ ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। মদীনায় আসার পর মুসলমানদেরকে সঙ্গবদ্ধ করা ও মদীনার সম্ভ্রান্ত ইহুদীদের সাথে সমঝোতার প্রাথমিক কাজগুলো সেরেই মুহাম্মদ (দঃ) সর্বপ্রথম এই বানিজ্য-পথের বিষয়টির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেণ। প্রথমে বানিজ্য-পথ ও লোহিত সাগর মধ্যবর্তি এলাকায় বসবাসকারীদের সাথে শান্তি চুক্তি বা মৈত্রী-বন্ধন সৃষ্ঠির চেষ্টা করেণ। সাথেসাথে পার্শ্ববর্তি অন্যান্য ছোট ছোট গোত্র যারা সমুদ্র উপকুল ও পাহাড়ি এলাকায় বাস করতেন তাদের সাথে তাবলীগের মাধ্যমে (মিশনারী কাজ) জোট-বদ্ধ হওয়ার উদ্যোগ নেন। উভয় কাজেই নবী (দঃ) পূর্ণ সফলকাম হন। তারপর এই বানিজ্য-পথ ধরে মুহাম্মদ (দঃ) কোরায়েশদের প্রতি হুশিয়ারী স্বরূপ ছোট ছোট দলের অভিযান প্রেরণ করতে থাকেন। একটি অভিযানে নবীজী (দঃ) স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। প্রথম হিজরীতে চারটি অভিযানের প্রথম অভিযান হামজা, দ্বিতীয় অভিযান উবায়দা বিন হারিস, তৃতীয় অভিযান সা'দ বিন আবি ওক্কাসের নেতৃত্বে প্রেরণ করা হয়। চতুর্থ অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন স্বয়ং আল্লাহর রাসুল (দঃ)। দ্বিতীয় হিজরীতে আরো দুটি অভিযান সেখানে পাঠানো হয়। লক্ষ্য করার বিষয় হলো, সবগুলো অভিযানের কোনটিতেই কারো সাথে কোন প্রকার সংঘাত বা রক্তপাত হয়নি এবং কোন বণিকদলকে আক্রমন বা কারো মালপত্র লুণ্টন করা হয়নি। আর কোন অভিযানেই মক্কার মুহাজিরিন ব্যতিত মদীনার কাউকে পাঠানো হয়নি, যা'তে কোরায়েশদের মধ্যকার জ্বলন্ত আগুন নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং সে আগুন অন্যান্যদের মধ্যে ছড়িয়ে না পড়ে। পক্ষান্তরে মক্কার কোরায়েশগণ মদীনাভিমুখে সন্ত্রাসীদল প্রেরণ করে মানুষের ধন-সম্পদ লুটপাট শুরু করে দেয়। উদাহরণ স্বরূপ- তাদের একটি অভিযানে কুর্জ বিন্ জাবির আল্ ফিহরির নেতৃত্বে একদল লোক মদীনার নিকটবর্তি এলাকা থেকে গবাদি-পশু চুরি করে নিয়ে যায়। অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়ালো যে, দ্বিতীয় হিজরীর শা'বান মাসে আবু-সুফিয়ানের তত্বাবধানে কোরায়েশদের বিরাট এক ব্যবসায়ীদল সিরিয়া থেকে ৫০ হাজার ডলার মূল্যের বানিজ্য-সামগ্রী নিয়ে মক্কা ফেরার পথে মদীনার অভ্যন্তরে এমন একটি এলাকায় এসে উপস্থিত হয় যেখানে আক্রমন করা মদীনাবাসির জন্যে খুবই সহজ। আবু-সুফিয়ান তার পূর্ব-অভিজ্ঞতা থেকে অনুমান করলেন মুসলমানগণ তাদেরকে আক্রমন করবে। তার ভয় হলো, মাত্র ৩০/৪০ জন লোকের হেফাজতে বিরাট মূল্যের মাল-পত্র নিয়ে মদীনা অতিক্রম করা সম্ভব নয়। আবু-সুফিয়ান সাহায্যের জন্যে মক্কায় একজন লোক পাঠালেন। লোকটি মক্কায় পৌছে চিৎকার করে ঘোষনা করলো- 'মক্কাবাসী, তোমাদের বণিক-দল মারাত্বক বিপদের সম্মুখীন। মুহাম্মদ তার দলবল নিয়ে বণিক-দলের নিকটবর্তি হয়ে যাচ্ছে। যদি তোমরা অতি শীঘ্র বেরিয়ে না পড়ো, আমি জানিনা

তোমরা তোমাদের মাল-পত্র উদ্ধার করতে পারবে কি না'। এই সংবাদে কোরায়েশগণ ভীষণ উত্তেজিত হলেন। তাদের বড় বড় নেতাগন তাতক্ষনিক যুদ্ধ-প্রস্তুতির ডাক দিলেন। অনুমানিক ১০০০ সৈন্যের স-সস্ত্র বাহিনী নিয়ে তারা মদীনাভিমুখে রওয়ানা হয়ে যান। তাদের উদ্দেশ্য শুধু বণিকদলকে উদ্ধার করাই নয় বরং উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যতে যা'তে এমন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে না হয় সে লক্ষ্যে মদীনায় তাদের বিপরীত নতুন শক্তির উত্থান চিরতরে ধ্বংস করে দেয়া আর মদীনার বানিজ্য-পথ কোরায়েশদের জন্যে চির উন্মুক্ত ও নিরাপদ রাখা।

আল্লাহ্‌র রাসুল (দঃ) যিনি সব সময়ই দেশের সার্বিক অবস্থার ওপর সতর্ক ও সজাগ দৃষ্টি রাখতেন, ভাবলেন এবার সময় এসে গেছে চুড়ান্ত ফয়সালার। আর এখনই শক্ত-সাহসী কঠিন পদক্ষেপ নেয়ার সেই উৎকৃষ্ট সময়। অন্যতায় নতুন ইসলামের উদিত আলো পৃথিবী থেকে চিরতরে নির্বাপিত হয়ে যাবে, ইসলাম আর কোনদিন মাথা তোলে দাঁড়াতে পারবেনা। এদিকে মাত্র দুই বৎসর হলো মক্‌কা থেকে আগত মুহাজিরীনগণ মদীনায় এসেছেন। তখনো অর্থনৈতিক ভাবে তারা ছিলেন খুবই দূর্বল। মদীনার আনসারগণও কোন প্রকার ঈমানী পরীক্ষার সম্মুখীন হন নি। তখন মুসলমানদের প্রতি ছিল স্থানীয় ইহুদীদের বৈরী-মনোভাব, পাশ্ববর্তি এলাকার কাফিরগণ ছিল কোরায়েশদের প্রতি সহানুভুতিশীল, আর স্বয়ং মদীনার মুসলমানদের মধ্যে একদল মানুষ ছিল মুনাফিক। এমতাবস্থায় কোরায়েশগণ যদি মদীনা দখল করে নেয় তাহলে হয়তো দুনিয়া থেকে মুসলমান জাতি চিরতরে বিলোপ হয়ে যাবে। আর যদি কোরায়েশগণ মদীনা দখল না করে শুধু তাদের বানিজ্য-কাফেলাকে শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে উদ্ধার করে নিয়ে যায়, আর মুসলমানগণ বসে বসে নীরব দর্শকের ভুমিকা পালন করেণ, তা'ও হবে মুসলমানদের জন্যে চরম অপমান। কারণ এভাবে সকল কাফির, মুশরিক, ইহুদী সহ সারা আরব বিশ্বে মুসলমানদের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়ে যাবে আর মদীনার মুনাফিকেরা প্রকাশ্যে তাদের বিরোধিতা শুরু করে দেবে। তখন মুসলমানদের জান-মাল, বাড়ি ঘর মান-সম্মানের কোন নিরাপত্তা তো থাকবেই না, মুহাজিরীনদের জন্যে মদীনায় বাস করাও হয়ে যাবে অসম্ভব। সেই সুযোগে কোরায়েশগণ আধিপত্য বিস্তার করবে সারা আরব জগতে। আল্লাহ্‌র রাসুল (দঃ) এ সকল দিক বিবেচনা করেই অস্ত্রের মাধ্যমে কোরায়েশদের মোকাবিলা করার চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন। তিনি মক্‌কার মুহাজিরীন ও মদীনার আনসারগণকে এক জরুরী বৈঠকে সমেবেত করেলেন। সকলের সামনে সার্বিক অবস্থা ব্যাখ্যা করে নবীজী (দঃ) বল্লেন-' উত্তর দিকে বিপুল পরিমাণ সামগ্রী নিয়ে একটি বানিজ্য কাফেলা, আর দক্ষিণ দিকে মক্‌কা থেকে একদল স-সস্ত্র সেনাবাহিনী মদীনাভিমুখে আসছে। আল্লাহ্‌ ওয়াদা করেছেন এই দুই দলের যে কোন একটি তোমাদের হস্তগত হবে। তোমরা এদের কোন্‌ দলকে আক্রমন করবে'? বেশীরভাগ লোক বানিজ্য কাফেলাকে আক্রমন করতে চাইলেন কিন্তু নবীজীর (দঃ) মনে ছিল অন্য একটি বিশেষ পরিকল্পনা। রাসুল (দঃ) তাঁর গোপন ইচ্ছে প্রকাশ না করে একই প্রশ্ন পুনরায় যখন করলেন, মক্‌কার মুহাজিরীনদের একজন, মিকাদ বিন আমর দাঁড়িয়ে বল্লেন- 'হে আল্লাহ্‌র রাসুল (দঃ) আপনি যে দিকে চাইবেন আমরা সে দিকেই যেতে রাজী আছি'। মদীনার মুসলমানগণকে নীরব নিরুত্তর দেখে নবীজী (দঃ) তাঁর সিদ্ধান্তের কথা তখনো প্রকাশ করলেন না। আনসারদের প্রত্যক্ষ সমর্থন ব্যতিত যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেয়া সঠিক হবেনা। মদীনার মুসলমানগণ ইতিপূর্বে ইসলামী কোন অভিযানে অংশগ্রহন করেন নি। এখন সুযোগ এসেছে তারা যে ওয়াদা করেছিলেন, ইসলামের জন্যে তাদের জান-মাল বিসর্জন দিতে রাজী তা প্রমাণ করার। রাসুল (দঃ) মদীনার আনসারগণকে সরাসরি

প্রশ্ন না করে পরোক্ষভাবে তাদের প্রতি ইঙ্গিত করে পুনরায় একই প্রশ্ন ব্যক্ত করলেন। এ পর্যায়ে এসে মদীনার সা'দ বিন মুয়াজ দাঁড়িয়ে বল্লেন-' হুজুর, প্রশ্নটি মনে হয় যেন আমাদেরকেই করা হয়েছে'। রাসুল (দঃ) বল্লেন, হাঁ। সা'দ বিন মুয়াজ বল্লেন- 'আমরা আপনাকে নবী বলে বিশ্বাস করেছি আর প্রতিজ্ঞা করেছি আপনি যা বলবেন তা সত্য বলে মেনে নেবো। সুতরাং হে আল্লাহ্‌র রাসুল (দঃ) আপনার ইচ্ছেই পুরণ করা হউক, আপনি আমাদেরকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর দিকে যেতে বল্লেও আমরা সেদিকে যেতে প্রস্তুত আছি। আর আমরা নিশ্চয়তা দিচ্ছি কাল যদি আপনি যুদ্ধের আহবান করেন, আমাদের একজন মানুষও পেছনে পড়ে থাকবেনা'। এর পর সিদ্ধান্ত হয় যে, বানিজ্য-কাফেলাকে আক্রমন নয়, বরং যুদ্ধের ময়দানে কোরায়েশদের মোকাবিলা করা হবে।

মাত্র ৩০০ জন অথবা তার চেয়ে সামান্য বেশী লোক যুদ্ধের জন্যে এগিয়ে এলেন। সমরাস্ত্র বলতে তাদের কাছে যা ছিল তা যুদ্ধের জন্যে মোটেই যথেষ্ট ছিলনা। খুবই অল্প লোক ছিলেন যারা সত্যিকার অর্থে ইসলামের জন্যে জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিলেন। বেশীরভাগ লোক এতই ভীত ছিলেন যে তারা ধরে নিয়েছিলেন, এ ভাবে যুদ্ধে যাওয়া, জেনে শুনে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে নিজেকে তোলে দেয়া ছাড়া আর কিছু নয়। আবার কিছু লোক এমনও ছিলেন যে তারা বুঝতেই পারেণ নি, ইসলাম গ্রহণ করার অর্থ যে ইসলামের জন্যে পরিবার পরিজন ত্যাগ করা, জান-মাল সহায় সম্পত্তি বিসর্জন দেয়া। এমন কি তারা এও বলেছিলেন যে, ধর্মের জন্যে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেয়া অত্যন্ত অপরিণামদর্শী, অযৌক্তিক ও অন্যায় । কিন্তু আল্লাহ্‌র রাসুল (দঃ) ও সত্যিকার বিশ্বাসীগণ এ সংকটময় মুহুর্তে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করেণ নি। তারা সোজা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে রওয়ানা হয়ে যান, যে দিক থেকে কোরায়েশ সৈন্যবাহিনী আসছিল। এতে সুস্পষ্ঠ প্রমাণিত হয় যে মুসলমাগণ বানিজ্য-কাফেলাকে আক্রমন করতে চান নি কারণ বানিজ্য-কাফেলা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আসছিল।

রমজান মাসের ১৭ তারিখ বদর প্রান্হে দুইদল মুখোমুখী হলেন। নবীজী (দঃ) দেখলেন, কোরায়েশদের সৈন্য-সংখ্যা মুসলমানদের চেয়ে তিনগুণ বেশী। তিনি আকাশ-পানে হাত তোলে প্রার্থনা করলেন- ' হে আল্লাহ্, মহা-দাপটে, অস্ত্র-সাজে সজ্জিত, গর্বিত এই সেই কোরায়েশগণ তোমার রাসুলকে মিথ্যা প্রমাণিত করতে এখানে উপস্থিত। এবার তোমার সাহায্য প্রেরণ করো যার ওয়াদা তুমি করেছিলে। হে, প্রভু, তোমার দাসদের এ ছোট্ট দলটি যদি আজ পরাজয় বরণ করে তাহলে জগতে তোমার উপাসনা করার মত একজন মানুষও থাকবে না'।

বদরের যুদ্ধে মক্কার মুহাজিরীনগণকে এক অগ্নি-পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। তাদেরকে যুদ্ধ করতে হয় আপন পরিবার ও প্রীয়জনদের বিরোদ্ধে। তলোয়ার ধরতে হয়েছিল, বাবার বিরোদ্ধে পিতা, ভাইয়ের বিরোদ্ধে ভাই, চাচার বিরোদ্ধে ভাতিজা, ভাগিনার বিরোদ্ধে মামাকে। আর একমাত্র তাদের পক্ষেই এমন অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব যারা আন্তরিক ভাবে সত্যকে (ইসলাম) গ্রহন করে মিথ্যার (কাফিরদের) সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে। অন্যদিকে মদীনার আনসারদের জন্যেও এ যুদ্ধ ছিল এক কঠিন পরীক্ষা। এ পর্যন্ত তারা শুধু মক্কার শক্তিশালী কোরায়েশদের ইচ্ছার বিরোদ্ধে মুহাজিরীনগণকে মদীনায় আশ্রয় দিয়েছিলেন, কিন্তু এবার মদীনাবাসী কোরায়েশদের বিরোদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, প্রকৃতপক্ষে তাদের সাথে এক দীর্ঘ-স্থায়ী যুদ্ধ ঘোষনা করে দেন। মাত্র কয়েক হাজার লোকের ছোট্ট আবাস ভুমি মদীনার পক্ষে বৃহত্তর মক্কা সহ সারা

আরব বিশ্বের বিরোদ্ধে অবস্থান নেয়া অবশ্যই কঠিন পরীক্ষা ছিল। ইসলামের জন্যে সর্বস্ব-ত্যাগী মুহাজিরীন ও আনসারগণের ত্যাগ আল্লাহ্ গ্রহন করে স্বীয় ওয়াদা মতো তাদেরকে পুরস্কৃত করেণ। মুসলমানদের অল্প জন-বল ও দূর্বল অস্ত্রের মুখে মহা শক্তিশালী কোরায়েশগন পর্যুদস্ত হয়ে যায়। কোরায়েশদের শীর্ষ-স্থানীয় বেশ কয়েকজন নেতা সহ ৭০ জন লোক এ যুদ্ধে নিহত ও ৭০ জন মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। তাদের প্রচুর সমরাস্ত্র, সাজ-সরঞ্জাম মুসলমানদের হস্তগত হয়। বলা বাহুল্য বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের এ চুড়ান্ত বিজয়, ইসলামকে এক বিরাট শক্তি হিসেবে বিশ্বের সামনে পরিচয় করিয়ে দেয়। তাই তো একজন পশ্চিমা গবেষক পন্ডিত বদরের যুদ্ধের ওপর মন্তব্য করেণ- 'বদর-যুদ্ধ' পূর্ববর্তি ইসলাম ছিল শুধুমাত্র রাষ্ট্রের একটি ধর্ম, বদর-যুদ্ধের পর রাষ্ট্রের ধর্ম ইসলাম নয় বরং ইসলাম স্বয়ং রাষ্ট্র হয়ে যায়'।

এই সে মহান 'বদর-যুদ্ধ' যার ওপর আলোচনা করা হয়েছে কোরআনের সুরা আনফালে। বলা হয়েছে মুসলমানগন যেন মনে না করেণ যে, এ চুড়ান্ত বিজয়, তাদের সাহস ও যুদ্ধে বিচক্ষণতার ফল বরং বিজয়ের সমুহ কৃতিত্ব একমাত্র আল্লাহ্র। কাফির মুশরিক, মুনাফিক ও যুদ্ধ-বন্দীদের ব্যাপারেও আলোচনা হয়েছে যেন তারা এ থেকে উচিৎ শিক্ষা পায়। যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদের ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেন মুসলমানগণ তা' তাদের নিজের মনে না করে। যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদের মালিক একমাত্র আল্লাহ্। তাদের জন্যে যতটুকু অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে ততটুকু যেন আল্লাহ্ প্রদত্ত পরিচ্ছন্ন হালাল মাল মনে করে তারা স্বাদরে গ্রহণ করে। তারপর আরো দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, কাফির ও মুসলমানদের আদর্শিক নৈতিক ভিন্নতার ওপর।

এ ছিল সুরা আল্-আন্ফালের শানে নুজুল। দ্বিতীয় সুরাটির নাম 'সুরা আত্তাওবাহ্'। আশ্চর্যজনক ভাবে কোরআনে 'সুরা আত্তাওবাহ্'ই একমাত্র সুরা যার শুরুতে বিস্মিল্লাহ্ পড়া হয়না। কেন হয়না, তা নিয়ে তফসিরকারকদের মধ্যে প্রচুর মতানৈক্য আছে। আরো আশ্চর্য ব্যাপার হলো, মুহাম্মদ (দঃ) এই সুরা লিখিয়েছিলেন নবম হিজরীতে অর্থাৎ সুরা আন্ফাল রচনার সাত বৎসর পরে। এই সাত বৎসরে ধুলি-ধুসর বালুকাময় মরুভুমিতে আরো অনেক যুদ্ধ হলো, বদরের পরে ওহুদের যুদ্ধে, খন্দকের যুদ্ধে, হুনাইনের যুদ্ধে, মুতা'র যুদ্ধে শতশত মানুষের গলা কাটাকাটি হলো, অনেক অনেক কথা মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ্র নামে কোরআনে লিখালেন, এতো সব বাদ দিয়ে সুরা 'আনফাল' এর পরপরই সুরা 'আত্তাওবাহ্' আসলো কি করে? কোরআনের প্রথম সুরা, 'বাকারা'ও নয়, সুরা 'ফাতিহা'ও নয়। হাতের কাছে কোরআনখানি এমনভাবে উপস্থাপন কারা কিভাবে করলেন? এ প্রশ্নের উত্তর বোধ করি হজরত উসমানের (রাঃ) কোরআন সংকলন কমিটির সেই বারোজন সদস্য ছাড়া আর কেউ জানেনা। মুহাম্মদ (দঃ) কোরআন সংকলন করেণ নি, তাঁর সে সময়ও ছিলনা।

এবার মৌলানা আবুল আ'লা মওদুদীর তাফহিমুল কোরআন (উর্দু-ভার্সন) থেকে 'সুরা তাওবাহ্'র শানে নুজুলের সারাংশ।
সুরাটি তিনটি পর্যায়ে নাজিল হয়। ১ থেকে ৩৭ পর্যন্ত আয়াতগুলো নাজিল হয় নবম হিজরীর জিলকদ মাসে অথবা এর নিকটবর্তি সময়ে, যখন মুহাম্মদ (দঃ) ইসলামের নতুন আইন সম্পর্কে মুশরিকগণকে অবহিত করার লক্ষ্যে হজরত আবুবকরের নেতৃত্বে একদল হজ্জ-যাত্রীকে মক্কায় প্রেরণ করেণ। ৩৮ থেকে ৭২ পর্যন্ত আয়াতগুলো নাজিল হয় একই বৎসরের রজব মাসে অথবা এর সামান্য পূর্বে, যখন মুহাম্মদ (দঃ) তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এ আয়াতগুলোতে

মুসলমানদের জন্যে যুদ্ধে অংশ গ্রহন করা আবশ্যিক প্রয়োজন বলে বিশেষভাবে তাগিদ দেয়া হয়েছে এবং মুশরকিদের (যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেছে অথচ ধর্মের জন্যে যুদ্ধ করতে রাজী নয়) তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে, কারণ তারা ইসলামের জন্যে তাদের ধন-সম্পদ ও জীবনের মায়া ত্যাগ করতে রাজী ছিলনা। ৭৩ থেকে ১২৯ পর্যন্ত আয়াতগুলো নবীজী (দঃ) 'তাবুক' যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর নাজিল হয়। এখানে মুনাফিকদের জন্যে রয়েছে ইসলাম-বিরোধী ভুমিকার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক ও হুশিয়ারী বাণী এবং স্বার্থপর ভীরু-কাপুরুষ মুসলমান যারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি তাদের জন্যে নিন্দা।

এই সুরায় বিশেষভাবে 'হুদায়বিয়া সন্ধি' এর পরবর্তি ঘঠনাবলীর বিবরণ স্থান পেয়েছে। তম্মধ্যে দুটি প্রধান ঘঠনার একটি ছিল কোরায়েশদের সাথে মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ, অপরটি রোমানদের সাথে তাবুকের যুদ্ধ। নবীজীর (দঃ) হিজরতের পর থেকে 'হুদায়বিয়া সন্ধি'র সময় পর্যন্ত ছয় বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে মুসলমানগণ আরবের প্রায় এক তৃতীয়াংশ জয় করে সেখানে এক নতুন সভ্য, শান্তিপূর্ণ, শক্তিশালী সংগঠিত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছেন। হুদায়বিয়ার সন্ধি নবীজীর (দঃ) জন্যে ইসলাম বিস্তারে বর্ধিত সুযোগ এনে দেয়। বিভিন্ন গোত্রের মানুষের কাছে তাবলিগী দল প্রেরণ করে ইসলাম প্রচারের কাজ চলতে থাকে। সন্ধির দুই বৎসরের মধ্যে মুলমানদের শক্তি ও সংখ্যা এতই বৃদ্ধি পেলো যে মক্কার কোরায়েশগণ ভাবতে লাগলেন, এই সন্ধির মাধ্যমে মারাত্নক ভুল হয়ে গেছে। তারা দুই বৎসরের মাথায় এসে সন্ধি ভঙ্গ করে, সকল শক্তি দিয়ে শেষবারের মতো ইসলামকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়ার লক্ষ্যে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে চাইলেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র রাসুল (দঃ) তাদেরকে সে সুযোগ দিলেন না। কোরায়েশগণ যথেষ্ঠ শক্তি ও সৈন্য জোগাড় করার আগেই নবীজী (দঃ) অষ্টম হিজরীর রমজান মাসে ১০ হাজার সৈন্য নিয়ে অতর্কিতভাবে মক্কা আক্রমন করেন। কোরায়েশগণ বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়। মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে যদিও কাফিরদের মেরুদন্ড ভেঙ্গে যায়, তারপরও মক্কা ও তায়েফের পার্শ্ববর্তি এলাকার বেশ কয়েকটি গোত্রের বিদ্রোহীগণ সমেবেতভাবে, অপ্রতিরোদ্ধ শক্তিশালী ইসলামকে ধ্বংস করার শেষ চেষ্টা করে। তাদের সাথে হুনাইন নামক স্থানে, অষ্টম হিজরীর শাওয়াল মাসের ছয় তারিখ, (২৭ জানুয়ারী ৬৩০ খৃষ্টাব্দ) মুসলমানদের যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধেও কাফিরগণ শোচনীয় ভাবে পরাজয় বরণ করে। হুনাইন যুদ্ধে কাফিরদের পরাজয়, সমস্ত আরব বিশ্বকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার পথ সুগম করে দেয়।

'হুদায়বিয়া সন্ধি' চলাকালিন সময়ে আল্লাহ্‌র রাসুল (দঃ) ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে আরব দেশের বিভিন্ন এলাকায় দলেদলে লোক পাঠাতে থাকেন। এমনি একটি দল সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলে, রোমান বাদশাহ্‌র অধীনস্থ খৃষ্টানবসতি এলাকায় প্রেরণ করা হয়। সেখানকার লোক মুসলমানদের ১৫জন সদস্যকে হত্যা করে ফেলে। আরেকটি দল ইরাকের বসোরায় পৌছুলে সেখানকার খৃষ্টান গভর্ণর শুরহাবিল বিন্ আমর, মুসলিম দলের নেতা হারিস বিন্ ওমরকে (যিনি রাসুলের (দঃ) রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে গিয়েছিলেন) হত্যা করে। আল্লাহ্‌র রাসুল (দঃ) ভাবলেন, এখনই রোম সাম্রাজ্য-সংলগ্ন এলাকায় মুসলমানদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। সেই লক্ষ্যে নবীজী (দঃ) হিজরী ৮ সালের জমাদি-উল্ উলা মাসে ৩ হাজার সৈন্য সিরিয়ার সীমান্ত এলাকায় প্রেরণ করেন। শুরহাবিলের এক লক্ষ সৈন্যের সাথে মুতা' নামক স্থানে মুসলমানদের সংঘর্ষ বাঁধে। অপর দিকে রোমান সম্রাট আরো এক লক্ষ সৈন্য তার ভাইয়ের নেতৃত্বে মুতা'র দিকে পাঠিয়েছিলেন। রোমান সৈন্যদল মুতা'য় পৌছার আগেই সংবাদ আসলো শুরহাবিল বিন্ আমর

মুসলমানদের কাছে পরাজয় বরণ করেছেন। রোম-সম্রাট উপলব্ধি করতে পারলেন রোম সহ সারা আরব বিশ্বই মারাত্মক হুমকির সম্মূখীন। তিনি মুতা' যুদ্ধের চরম অসম্মানজনক পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে পরবর্তি বৎসরেই যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। আল্লাহ্‌র রাসুল (দঃ) যিনি প্রতিমুহূর্তের ঘঠনাবলীর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন, রোমান সম্রাটের পরিকল্পনা যথা-সময়ে নবীজী (দঃ) টের পেয়ে তাতক্ষণিকভাবে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন। রাসুল (দঃ) প্রবল শক্তিশালী রোমানদের বিরোদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষনা করে তাঁর সৈন্যগণকে প্রস্তুত হওয়ার আহ্‌বান জানান। অন্যান্য সময়ে আক্রমনের কৌশল হিসেবে সাধারণতো আল্লাহ্‌র রাসুল (দঃ) কার ওপর, কোথায়, কখন, আক্রমন করা হবে তা প্রকাশ করতেন না, এমন কি মদীনা ত্যাগ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্তও তা গোপন রাখতেন। নবীজী (দঃ) জানেন এ যুদ্ধের ফলাফলই নির্ধারণ করবে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে ইসলামী বিপ্লব এ পর্যন্ত এসে দাঁড়িয়েছে তার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে গন্তব্য স্থানে পৌছুতে পারবে কি না। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম শক্তি রোমানদের সাথে যুদ্ধের গুরুত্ব বিবেচনা করেই এবার রাসুল (দঃ) সরাসরি খোলাখুলিভাবে তাঁর ৩০ হাজার সৈন্যকে সিরিয়াভিমুখে যাত্রার নির্দেশ দেন। সিরিয়ার পথে তাবুক নামক স্থানে পৌছে মুসলমানগণ দেখলেন যে, রোমান সম্রাট তার মিত্র-বাহিনী সহ সকল সৈন্য ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন এবং এখানে যুদ্ধ করার মতো প্রতিপক্ষ কেউ নেই। উল্লেখ্য, ঐতিহাসিকগণ যে, এ ঘঠনায় এমন ধারণা দিয়ে থাকেন যে, রোম-সম্রাট কখনো আরব সীমান্তে কোন সৈন্য মোতায়েন করেন নি, তা সত্য নয়। আসল ঘঠনা ছিল, রোমান সৈন্য ও তাদের মিত্র-বাহিনী আক্রমনের চুড়ান্ত প্রস্তুতি নেয়ার আগেই মুসলমানগণকে রণক্ষেত্রে উপস্থিত দেখে তারা পিছুটান হতে বাধ্য হয়েছিল। তারা জানেন মুতা' যুদ্ধে মাত্র ৩ হাজার মুসলমানদের হাতে শুরহাবিলের ১ লক্ষ সৈন্যের কি শোচনীয় পরাজয় হয়েছিল, আর এখানে ৩০ হাজার সৈন্য, তা'ও স্বয়ং রাসুল (দঃ) সেনাপতির দায়িত্বে। যুদ্ধের প্রয়োজন হলো না, নবীজী (দঃ) সিরিয়ার দিকে আর অগ্রসর না হয়ে তাবুকেই ২০ দিনের জন্যে থেমে গেলেন। তাবুকে অবস্থানকালে নবীজী (দঃ) ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনতা মেনে নেয়ার জন্যে আরব ও রোম সাম্রাজ্যের মধ্যবর্তি সীমান্ত এলাকায় বিভিন্ন গোত্রের অধিবাসীদের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। ফল-স্বরূপ, যে সকল ছোট ছোট প্রাদেশিক এলাকা রোম সম্রাটের অধীনস্থ ছিল তাদের অনেকেই ইসলামি রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করে মদীনায় কর পাঠাতে চুক্তিবদ্ধ হয়ে যায়। তাবুক অভিযানের মাধ্যমে মুসলমানদের বিরোদ্ধে আরব বিশ্বের সকল কাফির, বিশেষ করে মদীনার মুনাফিক যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহন করে আবার ইসলাম ত্যাগ করেছিল এবং নিজস্ব আলাদা মসজিদ তৈরী করে, ইসলামের অনিষ্ঠ সাধনে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল, তাদের পুনগঠিত হওয়ার সকল আশা নিঃশেষ হয়ে যায়। আর এভাবে ইসলাম রোম সাম্রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়। যে মহান উদ্দেশ্য নিয়ে জগতে আল্লাহ্‌র রাসুল (দঃ) প্রেরিত হয়েছিলেন অর্থাৎ বিশ্বে মুসলমানদের জন্যে সুনির্দিষ্ঠ ইসলামী রাষ্ট্র (দা-রুল ইসলাম) প্রতিষ্ঠা করা, তাতে পুরোপুরি সফলকাম হন। বিগত দিনগুলোর দিকে তাকালে দেখা যাবে এই সাফল্য (দা-রুল ইসলাম প্রতিষ্ঠা) অর্জন করতে মুসলমানদেরকে চারটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করতে হয়েছে। ১) সারা আরব দেশে পরিপূর্ণ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। ২) আরব দেশের পার্শ্ববর্তি দেশ সমুহে ইসলামের প্রভাব বিস্তার করা। ৩) অনিষ্টকারী মদীনার মুনাফিকদের পরিকল্পনা সমূলে নস্যাৎ করে দেয়া। ৪) মুসলমানগণকে অমুসলিম বিশ্বের সাথে যুদ্ধের জন্যে তৈরী করে নেয়া।

এখন যেহেতু সমস্ত আরবের প্রশাসন ক্ষমতা মুসলমানদের হাতে এসে গেছে, আর ইসলামের শত্রুদের বিদ্রোহ করার সমুহ শক্তি ধ্বংস করা হয়ে গেছে, সেহতু

সময় এসেছে, রাষ্ট্রকে পরিপূর্ণ ইসলামী রূপ দিতে নতুন আইন ঘোষনা করার। যে সকল নতুন আইন ও রাষ্ট্রীয় নিয়ম-কানুন নিয়ে সুরা তাওবাহ্'তে আলোচনা হয়েছে, সেগুলো নিম্নরূপ-

১-৩ আয়াতের মাধ্যমে পরিস্কার ঘোষনা দেয়া হয়েছে যে, এখন থেকে কাফির মুশরিকদের সাথে সকল প্রকার সন্ধি বা চুক্তি হতে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসুল (দঃ) মুক্ত হয়ে গেলেন। ৪ মাস বিরতির পর কাফিরদের সাথে মুসলমানদের সকল সন্ধি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কাফিরদের পুরনো জীবন-পদ্ধতির শেকড় চিরদিনের জন্যে উপড়ে ফেলতে, এ ঘোষনার প্রয়োজন ছিল, যা'তে আরবকে ইসলামের কেন্দ্রস্থল হিসেবে গড়ে তোলতে কাফিরগণ ভবিষ্যতে কোন দিন বাঁধার সৃষ্টি করতে না পারে। ১২-১৮ আয়াতের মাধ্যমে ঘোষনা দেয়া হয়েছে যে, কা'বা ঘরের ওপর কাফিরদের কোন অভিভাবকত্ব থাকতে পারে না, কা'বা ঘর শুধু মুসলমানদের হাতে থাকবে। মুশরিকদেরকে পবিত্র ঘরের নিকটে আসতে নিষেধ করা হয়েছে, যা'তে তাদের পুরনো সকল বিশ্বাস প্রথা-পদ্ধতি ও কুসংস্কারের চির-বিলুপ্তি ঘটে। আরবের বাহিরেও ইসলামের প্রভাব বিস্তারে মুসলমানগণকে অস্ত্রের মাধ্যমে অমুসলিম শক্তিকে ধ্বংস করে স্বাধীন সার্বভৌম ইসলমী রাষ্ট্রের স্বীকৃতি স্বরূপ অমুসলিমদেরকে কর প্রদানে বাধ্য করতে ২৯ নং আয়াতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

এবার মুনাফিকদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় এসেছে। যেহেতু মুনাফিকদের সমর্থনে বাহির থেকে কোন সাহায্য আসার আর ভয় নেই, সেহেতু এখন থেকে তাদেরকে প্রকাশ্যে কাফির বলে গণ্য করার জন্যে মুসলমানগণকে ৭৩-৭৪ নম্বর আয়াতে প্রেরণা দেয়া হয়েছে। দৃষ্টান্ত সরূপ নবী পাক (দঃ) সোয়ালিমের ঘর, যে ঘরে বসে মুনাফিকগণ শলা-পরপমর্শ করতো, আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। এবার তাবুক থেকে ফিরে এসে তাদের তৈরী সেই মসজিদটিও ভেঙ্গে আগুনে পুড়িয়ে ফেলার হুকুম দেন। দূর্বল চিত্তের মুসলমানদেরকে, যারা যুদ্ধে অংশ গ্রহন করতে অনীহা প্রকাশ করেছিল, তাদেরকে অন্তরের সকল সংষয় সন্দেহ দূর করে, সারা পৃথিবীর অমুসলিমদের বিরোদ্ধে জেহাদ করার জন্যে নিজেদেরকে মানসিকভাবে গড়ে তোলতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ৮১ থেকে ৯৬ আয়াত গুলোতে। আর পরিস্কার বলে দেয়া হয়েছে, যারা তাবুক যুদ্ধে অংশ গ্রহন করেনি, কেউ যদি পুনরায় তাদের মত ভবিষ্যতে অমুসলিমদের বিরোদ্ধে, তাদের জীবন, অর্থ-সম্পদ, সময় ও শক্তি দিয়ে জেহাদ করতে, বিন্দুমাত্র অবহেলা বা অনিচ্ছা প্রকাশ করে, তাদেরকে প্রকৃত মুসলমান হিসেবে গণ্য করা হবে না।

মৌলানা মওদুদী কর্তৃক বণীত সুরা দুটোর পটভুমি বা শানে' নুজুলের ওপর কোন মন্তব্য না করে দেখা যাক কোরআনের সুরা আত্-তাওবাহ্তে কি বলা হয়েছে।

সুরা আত্-তাওবাহ্-

১) আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসুলের তরফ থেকে অব্যাহতি ঘোষনা করা হলো সেই সকল মুশরিকদের প্রতি যাদের সাথে তোমরা চুক্তি করেছিলে।

হঠাৎ করে আউজুবিল্লাহ্ নেই বিস্মিল্লাহ্ নেই গরম গরম রেড ওয়ার্ণিং ! কিসের চুক্তি? সারা আরব বিশ্বে সন্ত্রাসের প্রলয় ঘটিয়ে, নিরপরাধ মানুষকে ঘর-ছাড়া করে, অবাদে নারী-পুরুষ জবাই করে, অগণিত শিশু হত্যা করে, ঘর-বাড়ি গাছ-বৃক্ষ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে, মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণ করে, নুন্যতম মানবিক অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে, এখন বুঝি মনে পড়লো হোদাইবিয়ায় সন্ধির কথা?

হোদাইবিয়ায় সন্ধি ছিল মক্কা আক্রমনের পূর্ব-পরিকল্পিত নীল-নক্শা। এই আয়াতটি মক্কা আক্রমন করার আগে উচ্চারণ করলে মানাতো ভাল।

২) সুতরাং চার মাস স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করো। আর মনে রেখো, তোমরা আল্লাহ্‌র হাত থেকে পালিয়ে যেতে পারবে না। আল্লাহ্‌ নিশ্চয়ই কাফিরদেরকে লাঞ্ছিত করে থাকেন।

আয়াতটি এরকম হওয়া উচিৎ ছিল- 'আর মনে রেখো, তোমরা আমার হাত থেকে পালিয়ে যেতে পারবে না। আমি নিশ্চয়ই কাফিরদেরকে লাঞ্ছিত করে থাকি'। কারণ কোরআন আল্লাহর কথাও আল্লাহর।

৩) আর এই মহান হজ্জের দিনে মানুষদের প্রতি আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র রাসুলের পক্ষ থেকে ঘোষনা দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ্‌ মুশরিকদের কাছ থেকে দায়-মুক্ত আর তাঁর রাসুলও। অবশ্য তোমরা যদি তওবা করো তা হবে তোমাদের জন্যে মঙ্গলজনক। অন্যতায় জেনে রেখো আল্লাহ্‌র হাত থেকে তোমাদের মুক্তি নেই। আর কাফিরদেরকে মর্মান্তিক শাস্তির সংবাদ দাও।

' আল্লাহ্‌ মুশরিকদের কাছ থেকে দায়-মুক্ত' এর মা'নেটা কি? আল্লাহ্‌কে কি মানুষের মতো জবাবদিহী করতে হয়? কোন দায়-বদ্ধতায় কি আল্লাহ্‌ কখনো দস্তখত করেছিলেন? হ্যাঁ, হুদাইবিয়ার সন্ধি-পত্রে (দশ বৎসরের শান্তি চুক্তি) দস্তখত করেছিলেন মুহাম্মদ বিন্‌ আব্দুল্লাহ্‌। হজরত আলীর লিখা সেই সন্ধি-পত্রে আল্লাহ্‌র নামটিও লিখা ছিল কিন্তু মুহাম্মদ বিনা দ্বিধায় নিজ হাতে নামটি মুছে ফেলে দিয়েছিলেন। আবু-তালিব, আবু-জেহেল তো কোনদিন মাথা-নত করেন নি, তারা তাদের আল্লাহর জন্যে জীবন দিয়ে গেছেন। আল্লাহ্‌র নামের হীন অপমান সহ্য করতে পারেন নি হজরত আবুবকর, আলী, ওমর ও উপস্থিত মুসলমানগণ। সহীহ বোখারী শরীফে প্রমান আছে, সেদিন ক্ষুব্ধ ওমর, হজরত আবুবকরকে প্রশ্ন করেছিলেন- উনি সত্যিই কি আল্লাহ্‌র নবী'?

৪) তবে যে সকল মুশরিকদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ, যারা তোমাদের সাথে কোন ত্রুটি করেনি, তোমাদের বিরোদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি, তাদের সাথে কৃত চুক্তি মেয়াদ পর্যন্ত পুরণ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ ধর্মপরায়ণদের ভালবাসেন।

এই ধর্মপরায়ণরা অনেক আগেই সকল চুক্তি ভঙ্গ করে মক্কায়, তায়েফে, হুনায়ইনে, মুতা'য়, শতশত নারী-শিশুকে বন্দী করে খুন করেছিলেন, এবং অমুসলিম মহিলাদেরকে তিন রাতের জন্যে কাম-উম্মাদ মুসলমানদের তৃষ্ণা নিবারণে বেশ্যা বানিয়েছিলেন। চুক্তির মেয়াদ কত দিন? চার মাস না দশ বৎসর?

৫) অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হয়ে গেলে, মুশরিকদের হত্যা করো যেখানে তাদেরকে পাও, তাদেরকে বন্দী করো আর ঘেরাও করো চতুর্দিক থেকে। আর ওঁত পেতে বসে থেকো প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামাজ পড়ে এবং যাকাত (কর) আদায় করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

কে বলে ইসলামে জবরদস্তি নেই? কোন্‌ মুর্খ দাবী করে ইসলাম অস্ত্রের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই? ধর্ম-নিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করে কেউ কি মুসলমান থাকতে পারে? ওপরের আয়াত অনুযায়ী মুসলমান না হয়ে অমুসলিম কেউ মুসলিম দেশে বাস করার কি কোন পথ খোলা আছে?

৬) আর মুশরিকদের কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় চায়, তবে তাকে আশ্রয় দেবে যাতে সে আল্লাহ্‌র কালাম শুনতে পারে এবং তাকে নিরাপদ স্থানে পৌছে দেবে। এটি এ জন্যে যে এদের কোন জ্ঞান নেই।

কল্পনা করা যায় দুষ্ট রাজনীতি একজন দরিদ্র, অশিক্ষিত, পিতৃহীন, মাতৃহীন, আশ্রয়হীন মানুষকে কেমন আত্মম্ভরী করে তোলে? মানবিক জ্ঞান কতটুকু নীচে নামলে একজন মানুষ বলতে পারে- 'আশ্রয় প্রার্থীকে আশ্রয় দেবে এ জন্যে যে তাদের কোন জ্ঞান নেই'। 'তাকে আশ্রয় দেবে যাতে সে আল্লাহ্‌র কালাম শুনতে পারে'। আর যদি সে মুহাম্মদের আল্লাহ্‌ ছাড়া তার নিজের আল্লাহ্‌র কালাম শুনে, তাহলে? তাহলে তার জন্যেতো ওঁৎ পাতানোই আছে তাই না?

৭) মুশরিকদের (অমুসলিম) সাথে কিরূপে আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র রাসুলের চুক্তি বলবৎ থাকবে, তবে তাদের ছাড়া যাদের সাথে তোমরা চুক্তি করেছিলে মসজিদুল-হারামের নিকটে? সুতরাং যতক্ষণ তারা তোমাদের প্রতি সরল থাকে তোমরাও ততক্ষণ তাদের প্রতি সরল থেকো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ ধর্মপরায়ণদের ভালবাসেন।

আল্লাহ্‌ যদি জানেন ওদের সাথে চুক্তি বলবৎ থাকবে না, তাহলে চুক্তিতে সই করলেন কেন? মানুষ চুক্তি ভঙ্গ করলো, তাই আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র রাসুলও মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে চুক্তি ভঙ্গ করলেন। মক্কা আক্রমন করলেন তারপর আরো কয়েকটি যুদ্ধে বেশ কিছু এলাকা দখল করলেন, প্রচুর ধন-সম্পদ লুট করলেন। মানুষ সরল হলে আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র রাসুলও সরল, মানুষ যুদ্ধ করলে আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র রাসুলও মানুষের সাথে যুদ্ধ করেণ। মানুষ ঠাট্টা করলে মশকরা করলে আল্লাহ্‌ও ঠাট্টা মশকরা করেণ, মানুষ মতলব-পরিকল্পনা করলে আল্লাহ্‌ও মতলব-পরিকল্পনা করেন। এ আল্লাহ্‌তো জীবন্ত এক মানুষ ছাড়া কিছু হতে পারে না।

৮) কেমন করে? (তাদের সাথে চুক্তি সম্ভব) তারাতো তোমাদের ওপর জয়ী হলে তাদের সাথে তোমাদের আত্মীয়তার বা চুক্তির মর্যাদা দেবে না। তারা মুখে তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করে কিন্তু তাদের অন্তরসমুহ তা অস্বীকার করে, আর তাদের অধিকাংশই ফাছিক (দুস্কৃতিকারী)।

এই কথাগুলো চুক্তিতে সই করার পূর্বে না বলে তাবুক থেকে ফিরে এসে বলা হচ্ছে কেন? এই যে কথায় কথায় তারা তারা আর মুশরিক, ফাছিক, কাফির, মুনাফিক বলা হচ্ছে এগুলো মুসলমানদের মনে অমুসলিমদের প্রতি চিরদিন ক্ষোভ, ঘৃণা, হিংসা-বিদ্ধেষের আগুন জ্বালিয়ে রাখার জন্যে নয় কি? কোরআন কি গালি শিক্ষার বই?

৯) তারা আল্লাহ্‌র আয়াত সমুহ অল্প মূল্যে বিক্রয় করে অতঃপর লোকদেরকে নিবৃত রাখে তাঁর পথ থেকে, তারা যা করছে তা অতি নিকৃষ্ট।

তাহলে, আল্লাহ্‌র আয়াত দ্বারা মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে ফেরানোর মত কথাও কোরআনে আছে? কি সেই আয়াতগুলো ছিল? সেগুলো মক্কায় না মদীনায় রচিত?

১০) তারা মুমিনদের সাথে আত্মীয়তার বা চুক্তির মর্যাদা দেয় না। আর তারাই সীমালংঘনকারী।
১১) অবশ্য তারা যদি তওবা করে, নামাজ কায়েম করে আর জাকাত আদায় করে তাহলে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই। আর আমরা নির্দেশাবলী বিশদভাবে বর্ণনা করি জ্ঞানীদের জন্যে।

মুখ দিয়ে তওবা করে, শরীর দিয়ে নামাজ কায়েম করে, আর অর্থ দিয়ে জাকাত আদায় করে তারা ধর্মীয় ভাই হয়ে গেলো। এর পর যদি যুদ্ধে না যায় তাহলে সেই ভাই মুনাফিক হয়ে যায়, তাই না? জ্ঞানীদের জন্যে বিশদভাবে বর্ণনার কি প্রয়োজন আছে? নামাজ কায়েম করার পদ্ধতির বিশদভাবে বর্ণনাটা কোথায়? এই জ্ঞাণীরাই তো বিশদভাবে বর্ণনা পড়ে নিজেদের মধ্যে খুনাখুনী করেছেন আজও করছেন এবং আখেরে তারাই ৭২ দলে ভাগ হবেন। শ্রম-জীবি মুর্খদের হাতে সেদিনও বর্শা-তলোয়ার ছিল না আজও বোমা-গ্রেনেড নেই।

১২) আর যদি তারা চুক্তি (শপথ) ভঙ্গ করে আর তোমাদের ধর্ম নিয়ে বিদ্রুপ করে তাহলে কাফির প্রধানদের সাথে যুদ্ধ করো, এদের শপথের কোন মূল্য নেই যে তারা বিরত থাকবে (দুস্কর্ম করা থেকে)।

তাদের অন্তর সম্মন্ধে এতো জ্ঞান থাকা সত্বেও আল্লাহ 'যদি' শব্দ ব্যবহার করলেন? পরধর্ম নিয়ে বিদ্রুপ করা মুহাম্মদের কোরআন ছাড়া আর কোন্ ধর্ম-গ্রন্থে আছে?

১৩) তোমরা কি সেই দলের সাথে যুদ্ধ করবেনা যারা তাদের শপথ ভঙ্গ করেছে এবং রাসুলকে বহিস্কারের সংকল্প করেছিল? তারাই আগে তোমাদেরকে আক্রমন করেছে। তোমরা কি তাদের ভয় করো? অথচ তোমাদের অধিকতর ভয়ের যোগ্য হলেন আল্লাহ্, যদি তোমরা মুমিন হও।

মাটির মানুষের কাছে আকাশের প্রতাপশালী আল্লাহ্র (না মুহাম্মদের) কেমন করুণ মিনতি ! বদর থেকে যুদ্ধ করে করে আর্মি ফেরেস্তারা কি মরে মরে সাফ হয়ে গেলেন, না কি সকলেই পেনশন পেয়ে গেছেন? এই আয়াতটি বলা হয়েছিল তাবুক অভিযানে যাওয়ার পুর্বে আর প্রথম আয়াতটি বলা হয়েছিল তাবুক থেকে ফিরে এসে। হাদিস সাক্ষী দেয় এই সুরার শেষ কিছু আয়াত সমুহ মক্কায় বলা হয়েছিল। পবিত্র বইখানিতে টেইলারিং কাজটা কারা করলেন?

১৪) তাদের সাথে যুদ্ধ করো, আল্লাহ্ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দেবেন। তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরোদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন আর মুসলমানদের অন্তর সমুহ শান্ত করবেন।
১৫) আর মুসলমানদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন। আর আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাশীল হবেন, আল্লাহ সর্ব-জ্ঞাতা পরমজ্ঞানী।
১৬) তোমরা কি মনে করো তোমাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে যতক্ষণ না আল্লাহ্ জেনে নেবেন, তোমরা কে যুদ্ধ করেছো এবং কে আল্লাহ ও তার রাসুল ও মুসলমান ব্যতিত অন্য কউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছো? তোমরা যা করো সে সম্মন্ধে আল্লাহ পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

কে যুদ্ধে গিয়েছিল আর কে যায় নাই তা জানার জন্যে কিছুটা সময় লাগবে বৈ কি। তবে এরা ভাল ভাবেই জেনে গেছে মুহাম্মদের পদতলে মাথা নোয়ানো ছাড়া তাদের আর কোন গতি নেই।

১৭) মুশরিকরা যোগ্যতা রাখে না আল্লাহ্র মসজিদ দেখাশুনা করার তারা নিজেরাই নিজেদের কুফরীর সাক্ষ্য দিচ্ছে। তাদের সকল কাজ (আমল) ব্যর্থ হবে এবং তারা চিরদিন আগুনের ভেতর বসবাস করবে।
১৮) নিশ্চয়ই তারাই আল্লাহ্র মসজিদ দেখাশুনা করবে যারা আল্লাহ্তে বিশ্বাস করে আর পরকালেও আর নামাজ কায়েম করে ও জাকাত আদায় করে, আর আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে ভয় করে না। অতএব আশা করা যায় এরা হেদায়ত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

‘অতএব আশা করা যায় এরা হেদায়ত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে’। আল্লাহ্‌রও মানুষের মতো আশা নিরাশা আছে? কথাটা বোধ হয় আল্লাহ্‌র নয় বরং মুহাম্মদের?

১৯) তোমরা কি হাজীদেরকে পানি সরবরাহ ও মসজিদুল-হারাম রক্ষণাবেক্ষণকে সেই লোকের সমান মনে করো, যে ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌র ওপর ও পরকালে, আর আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করেছে? এরা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সমান নয়, আর আল্লাহ্‌ জালিমদের হেদায়ত করেণ না।

মুহাম্মদ ভুলে গেছেন কথাগুলো যে সরাসরি আল্লাহ্‌র, তিনি মাধ্যম মাত্র। বাক্যগুলো স্পষ্টই প্রমাণ করে বক্তা আল্লাহ্‌ নয় বরং স্বয়ং মুহাম্মদ। আল্লাহ্‌র কাছে সুফীবাদের কোন মুল্য নেই আছে সন্ত্রাসের অপরিসীম পুরস্কার।

২০) যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং নিজের জীবন ও মাল দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছে, আল্লাহ্‌র কাছে তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আর তারাই সফলকাম।

জান আর মাল দিলে মর্যাদা ছাড়া আর কি কি পাওয়া যাবে?

২১) তাদের আল্লাহ্‌ তাদেরকে সু-সংবাদ দিচ্ছেন- স্বীয় দয়া ও সন্তোষের আর বেহেস্তের, সেখানে আছে তাদের জন্যে স্থায়ী শান্তি।

মুহাম্মদ ও তাঁর আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান আনার পর আর কি করতে হয়?

২৩) হে ঈমানদারগণ তোমরা তোমাদের স্বীয় পিতা ও ভাইদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা বিশ্বাসের চেয়ে অবিশ্বাসকে ভালবাসে। আর তোমাদের যারা তাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত।

শুধু জন্মদাতা পিতা আর সহোদর ভাই ত্যাগ করলেই হবে?

২৪) বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের ধন সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা তোমরা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় করো, তোমাদের বাসস্থান, যাকে তোমরা পছন্দ করো, আল্লাহ্‌ ও তার রাসুল ও আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধ করার চেয়ে অধিক প্রীয় মনে করো, তবে অপেক্ষা করো আল্লাহ্‌র নির্দেশ আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ্‌ ফাসেকদলকে হেদায়ত করেণ না।

সাধে কি আর মায়ের মমতা, বাবার আদর, সন্তানের মায়া, বোনের স্নেহ, স্ত্রীর ভালবাসাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে জেহাদীরা বোমা হাতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়?

২৫) আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে অনেক যুদ্ধে সাহায্য করেছেন, এবং হোনাইনের যুদ্ধেও যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিল, এবং তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি, পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্বেও তোমাদের জন্যে সংকুচিত হয়েছিল। অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়ে গিয়েছিলে।

কি আশ্চর্য ! সাহাবীগণ বেহেস্তের দরজা থেকে পালিয়ে গেলেন? বড় কমজোর ছিল তাদের ঈমান।

২৬) তারপর আল্লাহ্ নাজিল করেণ শান্তনা তার রাসুল ও মুমিনদের প্রতি, এবং অবতীর্ণ করেণ এমন এক সেনাবাহিনী যাদের তোমরা দেখতে পাওনি। আর শাস্তি প্রদান করেণ কাফিরদের, আর এটি হলো তাদের কর্মফল।

একজন মুমিন সমান দশজন কাফির নয়? এতো সৈনিক থাকা সত্বেও আকাশ থেকে ফেরেস্তা আর্মি নামাতে হলো? শুধু ফেরেস্তা আর্মি দিয়ে যুদ্ধ হয় না?

২৮) হে ঈমানদারগণ, মুশরিকরা তো অপবিত্র। সুতরাং এ বছরের পরে যেন তারা পবিত্র মসজিদের নিকটে না আসে। আর যদি তোমরা দারিদ্রের আশংকা করো তাহলে আল্লাহ্ চাইলে ভবিষ্যতে নিজ করুণায় তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন।
২৯) তোমরা যুদ্ধ করো আহলে-কিতাবের (তৌরাত, জবুর ও ইঞ্জিল কিতাব অনুসারী) ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ্ ও আখেরাতে বিশ্বাস করেনা, আর নিষেধ করেনা যা আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসুল নিষেধ করেছেন, এবং সত্য-ধর্ম গ্রহন করেনা, যতক্ষণ না করজোড়ে জিজিয়া (কর) প্রদান করেছে ও আনুগত্য মেনে নেয়।

তাদের যেহেতু কিতাব আছে সুতরাং তাদের আল্লাহ্ আছেন, নবী আছেন, আখেরাতও আছে। হঠাৎ করে তারা তাদের ধর্ম ত্যাগ করে মুহাম্মদের নতুন ধর্মকে সত্য-ধর্ম বলে গ্রহন করবে কেন? করজোড়ে কর প্রদান আর আনুগত্য মেনে নেয়ার সাথে ধর্মের সম্পর্কটা কি?

৩০) ইহুদীরা বলে উজায়র আল্লাহ্র পুত্র আর খৃষ্টানরা বলে ঈসা আল্লাহ্র পুত্র। এ হচ্ছে তাদের মুখের কথা। এরা পুর্ববতী কাফেরদের মত কথা বলে। আল্লাহ্ এদের ধ্বংস করুণ, তারা কেমন সত্য থেকে বিমুখ হয়।

আবারও পরধর্মের সমালোচনা বিদ্রুপ করা? আল্লাহ কি অন্য কোন আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করছেন- 'আল্লাহ্ এদের ধ্বংস করুণ' না কি এর আড়ালে মুহাম্মদ লুকানো? মুহাম্মদের সাথে বিয়ের সময় বিবি খাদিজা কি খৃষ্টান ছিলেন না? কোন্ ধর্মানুসারে মুহাম্মদ তাঁর দুই মেয়ে রোকেয়া ও কলসুমকে আবু-লাহাবের দুই পুত্রের সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন?

৩৩) তিনিই সেইজন যিনি আপন রাসুলকে পঠিয়েছেন হেদায়ত ও সত্য-ধর্ম দিয়ে, যেন এই ধর্মকে সকল ধর্মের ওপরে প্রধান্য দিতে পারেণ। যদিও মুশরিকগণ তা অপ্রীতিকর মনে করে।

অন্য ধর্মের ওপর নিজের ধর্মের প্রাধান্য বিস্তার করা তো সাম্প্রদায়ীকতা।

৩৮) হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হলো, যখন আল্লাহ্র পথে তোমাদেরকে বের হবার জন্যে বলা হয়, তখন তোমরা মাটি জড়িয়ে ধরো। তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে তুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ, দুনিয়ার ভোগ-বিলাস আখেরাতের তুলনায় খুবই অল্প।

কোথকার বাক্য কোথায় এনে লাগানো হয়েছে। বাক্যটি এই সুরার প্রথমে থাকার কথা। আর কতো যুদ্ধ? মানুষ একটু অব্যাহতি চায়।

৩৯) যদি তোমরা বের না হও, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভীষন শাস্তি দেবেন আর অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

এতোদিন আল্লাহ্র প্রীয় হয়ে থেকেও এরা আল্লাহ্র ক্ষতি করবেন তা কল্পনা করাও তো গুনাহ্। যাক আল্লাহ্র ইচ্ছে, তাঁর সব কিছুই কল্পনা করার অধিকার আছে।

৪০) যদি তোমরা তাঁকে (রাসুলকে) সাহায্য না করো তাহলে মনে রেখো, আল্লাহ্ তাঁকে সাহায্য করেছিলেন যখন কাফিরেরা তাঁকে বহিস্কার করেছিল। তিনি ছিলেন দুজনের একজন যখন তারা গুহার মধ্যে ছিলেন, তিনি তাঁর সঙ্গীকে বলেছিলেন বিষন্ন হয়ো না, আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন। তারপর আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সান্তনা নাজিল করলেন, এবং তাঁর সাহায্যে এমন এক বাহিনী পাঠালেন যাদের তোমরা দেখতে পাওনি। বস্তুতঃ আল্লাহ্ কাফিরদের মাথা নত করে দিলেন, আর আল্লাহ্র কথাই সদা সমুন্নত এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

এই বাক্যে বক্তা আল্লাহ্ না মুহাম্মদ না জিব্রাইল? এদের হলোটা কি? এতোভাবে কাকুতি মিনতি করা হচ্ছে, লোভ-লালসা, ভয়-ভীতিও দেখানো হচ্ছে, সর্বোপরি তারা জানেন তারা আছেন যতো আকাশ থেকে আসবেন ততো এবং মহা পরাক্রমশালী স্বয়ং আল্লাহও তাদের পক্ষে, তবুও যেন ওরা নড়তে চায় না। তাদের কি হুনাইনের সেই ভয়ানক জঙ্গলের কথা মনে পড়েছে, না কি রোমানদের ভয়ে তারা ভীত ! আর আল্লাহই বা কষ্ট করে বারবার সাদা বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ করতে ধরাতলে নেমে আসেন কেন? কিছু সময়ের জন্যে সুপারম্যান আজরাইলকে পঠিয়ে দিলেই তো হতো।

৪১) তোমরা বের হয়ে পড়ো অল্প অথবা প্রচুর সরঞ্জাম নিয়ে (যা কিছু আছে তা'ই নিয়ে) আর জিহাদ করো আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের প্রাণ ও মাল দিয়ে, এটি তোমাদের জন্যে খুবই উত্তম যদি তোমরা বুঝতে পারো।

মদীনার নতুন মুসলমানদের বুদ্ধী-সুদ্ধী মক্কার জিহাদী ভাইদের তুলনায় একটু কমই। এমনিতেই যুদ্ধে যেতে চায় না আর গেলেও যুদ্ধে পাওয়া মালের ওপর ভাগ বসাতে চায়। এরা তখন বুঝবে যখন মুনাফিকের খাতায় নাম উঠবে।

৪২) যদি (এ যুদ্ধে) আশু লাভের সম্ভাবনা থাকতো আর যাত্রা-পথ সংক্ষিপ্ত হতো তাহলে তারা নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে যেতো, কিন্তু দুর্গম পথ তাদের কাছে দীর্ঘ মনে হলো। তারা তোমার কাছে কসম খেয়ে বলবে- আমাদের সাধ্য থাকলে অবশ্যই তোমাদের সাথে বের হতাম, এরা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করেছে আর আল্লাহ্ জানেন এরা মিথ্যেবাদী।

মহা-শক্তিশালী রোম-সম্রাটের সাথে যুদ্ধ। নগদ মালের সম্ভাবনাও নেই। খামখা জানের ওপর রিস্ক নিতে কি সকলে চায়?

৪৩) আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুণ, আপনি কেন তাদেরকে অব্যাহতি দিলেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমার কাছে পরিস্কার হয়ে যেতো কে সত্য বলছে আর জেনে নিতেন কে মিথ্যেবাদী?

'আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুণ, আপনি কেন তাদেরকে অব্যাহতি দিলেন' কে বলছেন কথাটা? মুহাম্মদের কোন গুপ্তচর, কোন সাহাবী? ক্ষমা তাকেই করা হয় যে অপরাধ করে। আল্লাহ্র পারমিশন না নিয়ে মুহাম্মদ কাজটা করেলন কি !

৬৬) অজুহাত দেখিও না, তোমরা যে কাফির হয়ে গেছো ঈমান আনার পরও। তোমাদের কিছু লোককে যদি আমি ক্ষমা করে দেইও, অবশ্য কিছু লোককে আযাবও দেব কারণ তারা ছিল অপরাধী।

৭৯) যারা বিদ্রুপ করে সেই সকল মুসলমানদের প্রতি যারা মুক্ত মনে দান খয়রাত করে, এবং তাদের প্রতি যাদের কিছুই নেই নিজের পরিশ্রম লব্ধ সম্পদ ছাড়া। অতঃপর তারা ওদের প্রতি ঠাট্টা করে, আল্লাহ্ও তাদের প্রতি ঠাট্টা করেছেন এবং তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।

যে আল্লাহ্ বারবার বলেন তার কাছে আছে অফুরন্ত ধন-ভান্ডার, মানুষের সকল ধন তারই দেয়া, সেই আল্লাহ্ যখন মানুষের কাছে কর্জ চান, ভিক্ষে চান, বিজনেস করেণ, মানুষ একটু কনফিউজ্ড হবেই। মদীনার মানুষ মুসলমান হলো কিন্তু তাদের পরিশ্রম লব্ধ সম্পদ ছাড়া কিছুই নেই, আর মক্কার শরণার্থীদের কিছুই ছিলনা অথচ এখন দুই হাতে দান-খয়রাত করতে পারে, বিষয়টায় ভাববার হেতু আছে। যাক আল্লাহ্ও তাদের প্রতি ঠাট্টা করে নিয়েছেন। সমানে সমান হয়ে গেছে আর দুঃখ নেই।

৮০) তুমি তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করো আর না করো, যদি তাদের জন্যে সত্তরবারও ক্ষমা প্রার্থনা করো, তবু আল্লাহ ওদের ক্ষমা করবেন না। তা এ জন্যে যে তারা আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসুলকে অস্বীকার করেছে, আর আল্লাহ্ নাফরমানদেরকে পথ দেখান না।

আল্লাহ্র রাগ উঠে গেছে সুতরাং মুহাম্মদ ৭০ বার ক্ষমা প্রার্থনা করলেও তা কবুল হবে না। তবে যদি একাত্তরবার করেণ?

৮১) পেছনে রয়ে যাওয়া লোকেরা আল্লাহ্র রাসুল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে থাকতে পেরে আনন্দবোধ করেছে, আর তাদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধ করতে অপছন্দ করেছে এবং বলেছে এই গরমের দিনে অভিযানে বের হয়ো না। বলে দাও জাহান্নামের আগুন অনেক বেশী উত্তপ্ত যদি তারা বুঝতে পারতো।
৮২) অতএব তারা সামান্য হেসে নিক। তাদের কৃতকর্মের বদলে অনেক বেশী কাঁদবে।

তারা হাসলো আর আল্লাহ্ হাসলেন না, এ কেমন কথা?

৮৩) কাজেই আল্লাহ্ যদি তোমাকে ফিরিয়ে আনেন (তাবুক থেকে) তাদের কোন দলের মাঝে আর তারা তোমার সাথে বেরুবার অনুমতি চায় তুমি বলো- তোমরা কোন সময়ই আর আমার সাথে যেতে পারবে না এবং আমার পক্ষ হয়ে কোন শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবে না। নিশ্চয়ই তোমরা তো প্রথমবারে পেছনে থেকেছ সুতরাং পেছনে থাকার দলেই থেকো।

'আল্লাহ্ যদি তোমাকে ফিরিয়ে আনেন' কথাটা যেন কোন মানুষের মুখ থেকে উচ্চারিত মনে হলো।

৮৪) তাদের কারো মৃত্যু হলে তুমি তাদের জন্যে নামাজ পড়বে না, তার কবরের পাশেও দাঁড়াবে না। তারা তো আল্লাহ্র প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে, আর রাসুলের প্রতিও, আর তারা মরেছেও নাফরমান অবস্থায়।

যুদ্ধে অংশ গ্রহন না করার অর্থ বুঝি আল্লাহ্ ও রাসুলের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা? এরা কি মুসলমান ছিল?

৯৪) তুমি যখন তাদের কাছে ফিরে আসবে, তারা তোমার কাছে এসে ছলনা করবে, তুমি বলো ছলনা করো না আমি কখনো তোমাদের কথা শুনবো না, আল্লাহ আমাকে তোমাদের সম্মন্ধে জানিয়ে দিয়েছেন। আর এখন থেকে আল্লাহ্ই তোমাদের কার্য্য-কলাপ লক্ষ্য করবেন আর তার রাসুলও। তারপর তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে সেই জ্ঞাত-অজ্ঞাত বিষয়ে অবগত সত্তার কাছে। তিনিই তোমাদের বলে দেবেন তোমরা যা করেছিলে।
৯৫) যখন তুমি তাদের কাছে ফিরে আসবে, তারা আল্লাহ্র কসম খাবে, যেন তুমি তাদের উপেক্ষা করো, সুতরাং তুমি তাদের উপেক্ষা করো, নিঃসন্দেহে এরা না-পাক এবং এদের গন্তব্যস্থল হলো জাহান্নাম।
৯৫) তারা তোমার কাছে কসম খাবে যেন তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাও, তোমরা যদি সন্তুষ্ট হয়েই যাও তবু এ নাফরমানদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হবেন না।

হাইকোর্ট থেকে জামিন পেলে কি হবে, সুপ্রিম কৌর্টে আপিল হয়ে গেছে, ছাড়া পাওয়ার সম্ভাবনা মোটেই নেই। 'ভবিষ্যত-কাল' দিয়ে বলা বাক্যগুলো, ঘঠনা ঘটে যাওয়ার পর খোঁজ-খবর নিয়ে তারপর প্রকাশ করা হচ্ছে কেন?

১০২) কোন কোন লোক আছে যারা তাদের অপরাধ স্বীকার করেছে। তারা এক ভাল কাজের সাথে অপর মন্দ কাজ মিশিয়ে ফেলেছে। আল্লাহ হয়তো তাদের ক্ষমা করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

'আল্লাহ হয়তো তাদের ক্ষমা করে দেবেন' কথাটা আল্লাহ্র?

১০৩) তাদের ধন-সম্পদ থেকে সদকা (দান) গ্রহণ করো যাতে তুমি সেগুলোকে পবিত্র ও বরকতময় করতে পারো। আর তুমি তাদের জন্যে দোয়া করো। তোমার দোয়া তাদের জন্যে শান্তনা স্বরূপ। আসলে আল্লাহ্ সবকিছু শুনেন ও জানেন।

সর্বনাশ, বলেন কি ! এরই মধ্যে কালো টাকা সাদা হয়ে গেলো? তবুও শুকরিয়া টাকার গন্ধ পেয়ে আল্লাহ যে মাইন্ড চেইন্জ করেছেন। এবার তো আল্লাহ্র গুস্বা কিছুটা শীতল হয়েছে। তা- দোয়া কতবার করতে হবে? ৭০ বার না ৭১ বার?

১০৭) যারা জিদের বশে মসজিদ নির্মান করেছে, তাদের ঘাটি স্বরূপ, কুফরির তাড়নায়, মুমিনদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, পূর্ব থেকে যুদ্ধ করে আসছে আল্লাহ্ ও তার রাসুলের সাথে, তারা কসম খেয়ে বলবে- আমরা যা করেছি মঙ্গলের জন্যে করেছি। অথচ আল্লাহ সাক্ষী যে তারা সবাই মিথ্যুক।

কৌর্ট নেই, কাছারী নেই সাক্ষী হাজির। আবার কেউ সাক্ষীকে দেখেও না।

১১১) আল্লাহ্ মুমিনদের জান ও মাল খরিদ করে নিয়েছেন এই মূল্যে যে তাদের জন্যে রয়েছে বেহেস্ত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহ্র রাস্তায় অতঃপর মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল, কোরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহ্র চেয়ে নিজ ওয়াদাতে সত্যনিষ্ট আর কে আছে? অতএব তোমরা আনন্দ করো

তোমাদের সওদার জন্যে যা তোমরা তাঁর সাথে করেছ। আর এটি হচ্ছে মহা সাফল্য।

জান- মাল নগদ, দৃশ্যমান ও বাস্তব কিন্তু বেহেস্ত বাকী, অদৃশ্য ও কল্পনা, এ কেমন বিজনেস?

১২৩) হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিকটবর্তি কাফিরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও, তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক, আর জেনে রেখো আল্লাহ্ মুত্তাকিনদের সাথে আছেন।

এ আয়াত অনুসরণ করেই, সারা পৃথিবী জুড়ে ঈমানদারগণ (অবশ্য যারা প্রকৃত ঈমানদার) কাফির নিধনে লিপ্ত আছেন এবং এ যুদ্ধ অনাদিকাল চলবে। এ কোরআনই শিক্ষা দেয়া হয় ইসলামী সেন্টার, মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তব, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে। কোরআন হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণা-সন্ত্রাসের একটি পূর্ণাঙ্গ দলিল. নট এ কমপ্লিট কোড অফ লাইফ।

সমাপ্ত।